ডাবল ডিল

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

১. শান্ত বিকেল 2
২. কলের উৎস 61
৩. সমাধির মূল ফলক 119
৪. প্যারিসে বৈকালিক কনফারেন্স 168
৫. মিউনিখের রাস্তায় 227

১. শান্ত বিকেল

চব্বিশে মে, রবিবার।

সারা জায়গাটা জুড়ে শান্ত বিকেল নেমে আসছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে ভারী মোহময় পরিবেশ। একটা পাওয়ার বোট ব্যাভেরিয়ার লিন্ডাউ বন্দর ছেড়ে এগিয়ে চলেছে। কিছুটা দূরেই দেখা যাচ্ছে কোনট্যানজ লেক। বোটের চালক চার্লস ওয়ার্নার। একভাবে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। প্রচণ্ড সাবধানী। হাওয়া বুঝে সতর্ক হওয়ার ব্যাপারে ওস্তাদ। তাকানো দেখে বোঝা যাবে না মনে কি আছে।

***

এর ঠিক দুদিন পরে। জায়গাটা হচ্ছে লন্ডন। দু'জন ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। একজন টুইড, অপরজন মার্টেল। কথা প্রসঙ্গে টুইড মার্টেলকে বলল, বুঝলে খুনটা বেশ নৃশংস। ঝুঁকি নিয়েই করা হয়েছে।

ওয়ার্নার পাওয়ার বোট-এ সাগরের বুক চিরে এগোতে এগোতে সবেমাত্র বন্দর ছাড়িয়েছে। সামনেই ডানদিকে পাথরের একটা সিংহমূর্তি আর বাঁদিকে বিরাট উঁচু লাইট হাউস। মাঝখান দিয়ে স্পীডে এগিয়ে চলেছে,ওয়ার্নার-এর পাওয়ার বোট। হঠাৎ সেই মুহূর্তে কোথা থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো।

ওয়ার্নার-এর বয়স চল্লিশ। পাতলা–চেহারা। ছটফুটে, হাসিখুশি স্বভাবের। পরনে একটা জার্মান স্যুট। মাথায় টুপী। সামনেই লেক। দূরে তাকালো ও। না, সন্দেহজনক কিছু নয়।

বিকেলের সোনালী সূর্যের আলোয় মাখামাখি সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল বালিয়াড়িতে। অদূরে ভেসে চলেছিল হাল্কা পালতোলা নৌকো। বেশ কিছু দূরে লিবেনটিন আর সুইজারল্যান্ডের বরফ ঢাকা পাহাড়ের দুটো অসমান চুড়ো। ওয়ার্নার দূরে তাকালো। তার চোখে পড়ল দুটো সাদা রঙের স্টীমার। যেগুলো ছুটে চলেছে জার্মান শহর কোনস্ট্যানজের দিকে।

সমুদ্রের স্বচ্ছ,নীলচে জল। বাতাসের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ তার ওপরেনানা ধরনের নক্সা তৈরীকরছে। রহস্যময়, ঠিক ঐ জায়গাটায় কিছু মানুষকে দেখা যাচ্ছে। মোট ছ’জন। বাতাস কাটতে কাটতে ওরা এদিকেই এগিয়ে আসছে।

এই তোমরা চলে যাও। ওয়ার্নার একভাবে তাকিয়ে চীৎকার করে ওদের বলল। নিজের ইঞ্জিনটা খানিকটা পিছিয়ে নিল। সবাই সুগঠিত চেহারার যুবক। পরনে স্নানের পোশাক। দু’জনের সোনালী চুল। ওদের নৌকোগুলো ধনুকের মতো। ওয়ার্নার অনুভব করল তার নৌকো তটরেখা থেকে আর আধমাইল। ওরা ছ’জন চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওয়ার্নার নিজের বোটটা থামিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল, এই তোমরা চলে যাও এখান থেকে।

চীৎকার করে বললেও, তখনও ওয়ার্নারের মনে কোন রকম বিরক্তির প্রকাশ ছিল না।

কিন্তু ওরা ক্রমশঃ আরো কাছে আসতে লাগল। তখন ওয়ার্নার তাড়া করে খানিকটা এগিয়ে গেল। সোনালী চুলের লম্বা যুবকটি বোটের একেবারে কাছে। তার বাঁহাতে পাল আর ডান হাতে ছুরি। ওয়ার্নার বিপদ বুঝে সাবধান হবার আগেই ওরা ওর বোটটাকে ঘিরে ফেলেছে। যুবকটি লাফিয়ে ওর পাওয়ার বোটে চলে এলো। আর ওকে লক্ষ্য করে মুহূর্তের মধ্যে কোণাকুনি ভাবে ছুরিটা চালালো। ইতিমধ্যে পাঁচখানা নৌকা ওকে মাকড়সার জালের মতো ঘিরে ফেলেছে। দূরে কোথাও জল পুলিশ আছে কিনা সে ব্যাপারে তাদের হৃক্ষেপ ছিল না।

ওদের চক্রব্যুহ ভেদ করে পাওয়ার বোটটা নজরে আসা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। ততক্ষণে সোনালী চুলের যুবকটি কসাই-এর কাজ সেরে লাফিয়ে নিজের নৌকোয় উঠে গেল। আর সবাই মিলে দ্রুত নৌকাগুলো চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদূরে অস্ট্রিয়ার সীমারেখা। দেখা যাচ্ছে শুধু ধূ ধূ তীরভূমি।

***

এতো অনেকবার ছুরি মারা হয়েছে। উন্মাদ না হলে এরকম ভাবে কেউ খুন করে না। শরীরটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

কথাগুলো বলছিলেন পুলিশ সার্জেন্ট ডরনার। আর মৃত ব্যক্তিটি হলো চার্লস ওয়ার্নার। পাওয়ার বোটটার ভেতর ওর নিপ্রাণ দেহটা পড়ে ছিল।

সার্জেন্ট ডরনারের জীবনে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ওর সঙ্গে কমবয়েসী পুলিশটা লাশটার সমস্ত কিছু পরীক্ষা করছিল।

হঠাৎ পায়ের কাছে কিসের একটা স্পর্শে ওর ভুরু কুঁচকে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সেটা কুড়িয়ে পকেটে চালান করল। ত্রিকোণাকৃতি অনেকটা ডেলটার মতো একটা ব্যাজ। ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়ে থাকা দেহটার দিকে আর একবার দেখলোঁ। লাশটার পকেট থেকে বার করা ওয়ালেট থেকে ডরনার পাসপোর্টটা বার করলো। তারপর আবার বলে উঠলোলোকটা ইংরেজ। আরে ব্যাগটায় তো অনেক টাকাও আছে দেখছি।

–ওরা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি...।

অসমাপ্ত বাক্যটা ডরনারের সহকারী বুস বলে উঠলো। ততক্ষণে মৃতদেহের চোখ দুটো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খানিকক্ষণ পরে ও আবার বলে উঠলো শয়তানগুলোর তো কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। কাজ সেরে তাড়াতাড়ি সরে পড়েছে...।

ডরনার বলল, কিন্তু এই ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে এক সেকেন্ডের বেশী লাগত না।

একটু থেমে বলল, অদ্ভুত রকমের খুন।কথা বলতে বলতে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। হঠাৎব্যাগের মধ্যে একটা প্লাস্টিক কার্ড নজরে পড়ল। অনেকটা ক্রেডিট কার্ডের মতো। সবুজ আর লাল ডোরাকাটা। কার্ডটা দেখে ডরনার বুঝলো ওটা ক্রেডিট কার্ড নয়। আর পাঁচ অক্ষরের একটা কোড নম্বর, যেটা লন্ডন শহরকে বোঝায়।

বুস বলে উঠলো, ব্যাপার কি?

ডরনারের মুখ দেখে বুস অনুমান করছিল সমস্যা বেশ জটিল। ডরনার কার্ডটা ওয়ালেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে কি যেন ভাবছিল। খানিক পরে ও আর বুস দু'জনেই পাওয়ার বোটের একেবারে নিচে এসে নীচু স্বরে কথাবার্তা বলতে লাগলো।

ব্যাপার গোপন রাখতে হবে। প্রথমেই আমাদের পুলাকে বি. এন. ডি-তে জানাতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি...।

তার মানে ও...।

–আমি কিছুই মনে করতে চাইছি না। কিন্তু লন্ডনের লোকেরা রাতের আগেই সমস্ত কিছু জানতে চাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে, আর সেটাই আমাকে চিন্তায় ফেলেছে।

***

পুলিশ লঞ্চের ওপরের দিকটায় সার্জেন্ট ডরনার দাঁড়িয়েছিল। লিন্ডাউ বন্দরে ওদের লঞ্চটা ক্রমশ এসে পৌঁছেছিল। লাশটা একটা ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। একটা শক্ত দড়ি দিয়ে পাওয়ার বোটটা লঞ্চটার সঙ্গে বাঁধা ছিল। ডরনার চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

মৃতদেহের পিছন দিকটা ভয়াবহ আকার ধারণ করায় ডরনার চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কথাটা বুসকেও জানায়নি সে।

–ঐ ছয়জন অপরাধীকে তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখো। ওরা সম্ভবত এখন এই তীরভূমিতেই এসেছে। খুব কাছাকাছি ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে। কিন্তু সাবধান ওরা সবাই সশস্ত্র।

ডরনার তার রেডিও অপারেটরকে সংকেতে কথাগুলো জানালো। ওরা ততক্ষণে লিন্ডাউ-এ দ্বিতীয়বারের সফর আরম্ভ করেছে। এদিকে পুলিশের হেড কোয়ার্টারে তখন সংকেত পাঠানো হচ্ছে।

–আমার মনে হচ্ছে ওর পেছনে কয়েকটা অদ্ভুত চিহ্ন আছে।

ওয়ার্নারের দিকে তাকিয়ে বুস মন্তব্যটা করলো। লঞ্চ ততক্ষণে বন্দরের কাছে এসে গেছে। বুস সাইরেন বাজালো।

–প্রায় অনেকটা, কিছু একটা চিহ্নের মতো। কিন্তু কিসের চিহ্ন কে জানে। জায়গাটায় এত বেশী রক্ত জমেছিল যে...।

তুমি তোমার কাজ করে যাও, বিরক্তির সঙ্গে ডরনার কথাটা বলল।

সূর্য ক্রমশ নিম্নগামী। চমৎকার পরিবেশ। ওরা ছোট্ট বন্দরটায় আস্তে আস্তে পূর্ব দিকের অভিমুখে এগোতে লাগল। ওখানে লঞ্চ দাঁড়ানোর জায়গা। ডরনার সকলের চোখ এড়িয়ে মৃতদেহটাকে কিভাবে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া যায় তাই ভাবছিল। চার্লস ওয়ার্নারের দেহটা ইতিমধ্যেই পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে নিয়েছে। সুতরাং উতলা হবারও প্রয়োজন নেই।

***

পুরানো ধাঁচের সিন্ডাই শহরটার বাড়িঘরগুলো মধ্যযুগীয় ধরনের। কোনট্যানজ লেকের শেষপ্রান্তে পূর্বদিকের দ্বীপটায় অনেক সরু সরু রাস্তা আছে। গাড়িতে বা ট্রেনে এ জায়গায় আসার জন্য দুটো আলাদা রাস্তা আছে। সৌখিন হোটেলও আছে।

পাতলা চেহারার তীক্ষ্ণ মুখের এক যুবক দাঁড়িয়েছিল। পরনে জিনসের প্যান্ট আর শার্ট, বয়স কুড়ি বছর। যুবকটি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত। আনমনে ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল সে। বন্দরের পুলিশ লঞ্চটার দিকে একবার তাকালো। হঠাৎ চোখ পড়ল পেছনের দিকে পাওয়ার বোটটার দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দ্রুত একটা বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। হাত ঘড়িটা দেখে নিল।

ফোনের বুথের সামনে পৌঁছে সে ঢোকার আগে আর একবার দেখে নিল সামনের অফিসটা থেকে কেউ আসছে কিনা।

নিশ্চিত হয়ে ও একটা নম্বর ডায়াল করল। কোনো একটা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটা যুবতী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ও বলল, আমি এডগার ব্রাউন বলছি।

অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এলো, আমি ক্লারা, হাতে একদম সময় নেই, এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি...।

যুবক হু বলে খানিকক্ষণ থেমে বলল, তোমাকে জানাচ্ছি যে আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারটা অবশেষে পৌঁছে গেছে।

–এত তাড়াতাড়ি?

পাওয়ার বোটের মধ্যে একটা দেহ রয়েছে শুনে ক্লারার কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

–তুমি নিশ্চিত তো, ক্লারা প্রশ্ন করলো।

–নিশ্চিত না হয়ে আমি কিছু বলিনা, তুমি কি সবকিছু জানতে চাও?

না-না। অত তাড়াহুড়োর কি আছে? যাইহোক জানানোর জন্য ধন্যবাদ...। স্বাভাবিক কণ্ঠে। বলল ক্লারা।

–আমার ফি? ব্রাউন গলার স্বরটা একটু চড়িয়ে দিল।

দাঁড়াও, পোষ্টঅফিস থেকে নিতে হবে। দিন দুয়েক সময় লাগবে। মনে রাখবে তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। কাজটা অত সোজা ভেবোনা।ব্রাউনের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে গেল।

ক্লারা ফোনটা ছেড়ে দিল। ফোনটার দিকে তাকিয়ে কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বুথ ছেড়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়ালো। ব্রাউন নিজের লক্ষ্য রাখার ব্যাপারটা ভালই জানে। কিন্তু ক্লারার সঙ্গে ওর আলাপই হয়নি। যে সংস্থার হয়ে ও গুপ্তচরের কাজে নেমেছে, তাদের ব্যাপারে ও কিছুই জানেনা। ক্লারার নম্বরটা অবশ্য স্টাটগার্ট-এর।

***

স্টাটগার্টের চমৎকার পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট। সাতাশ বছরের আকর্ষণীয়া ক্লারা ঘরের মধ্যে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের মুখ পরখ করছিল। আগে মডেলিং পেশায় ছিল। শহরের সেরা পার্লারে চুলের পরিচর্যা করে। ওয়ারড্রোবে ওর যা পোষাক আছে তা অন্যের ঈর্ষার বস্তু।

ওর চোখ দুটো গভীর কালো, আবেদনময়ী।

ঠোঁটের সিগারেটটা নিয়ে নিজের সাদা ফোনটা ধরবে কিনা ভাবছিল, তারপর অ্যাপার্টমেন্টের মালিককে ডাকলো। এরপর আধপোড়া সিগারেটটা ফেলে দক্ষিণ ব্যাভেরিয়ার একটা নম্বর ডায়াল করল।

ঠিক তারপরই উত্তর-পূর্ব লিন্ডাউ-এর কয়েক মাইল ভেতরে অনেকটা দূর্গের মতো একটা ফার্মের মধ্যের একটা কক্ষে চামড়ার একটা হাত রিসিভার তুললো। সেই হাতের আঙুলে একটা হীরের আংটি শোভা পাচ্ছে। বাঁদিকের রিস্টে নামকরা কোম্পানীর দামী রিস্টওয়াচ।

–হ্যাঁ, বলছি।

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর ঐ বাক্যটা উচ্চারণ করলো। এ প্রান্ত থেকে ভেসে এলো, ক্লারা বলছি।

-হ্যাঁ। আমি যে লোমের পোষাকটা পাঠিয়েছিলাম পেয়েছেন তো? ভাল। আর কোন খবর? ক্লারা খানিকটা ইতস্ততঃ করে ব্রাউনের খবরটা জানালো।

তুমি বলছো তাহলে, ওটা এসে পৌঁছেছে?

–হ্যাঁ। আমি জানি এবার তুমি খানিকটা পেয়েছ।

কিন্তু ষাট বছরের বৃদ্ধ মানুষটা মনের প্রতিক্রিয়া গোপন করে গেল। ভীষণ সতর্কতার প্রয়োজন। পুলিশ ইতিমধ্যেই দেহটা খুঁজে পেয়েছে।

পরিকল্পনামত একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে, ওটা ওয়ার্নার-এর দেহ এবং ওটা পুলিশের হেফাজতে। সূত্র অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

–তুমি নিশ্চিত? খুব তাড়াতাড়ি...।

একটু কাঁপা কণ্ঠস্বরে ক্লারা বলল, আমি তো ওখানে ছিলাম না...। আমি তো তোমাকে বললাম পাঁচ মিনিট আগে আমাদের লোক কি বলল...।

সেই বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবার, যাইহোক, তুমি মনে রেখো যে, আমার সঙ্গে কথা বলছো।

এই কথাটা বলে রিসিভার রেখে সোনার লাইটারে চুরুট ধরালো।

ওদিকে ক্লারা বিরক্তির সঙ্গে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই ফোন কেটে গেল। ক্লারার সমস্ত খরচ-খরচা ওই বহন করে। তবুও...।

ক্লারা গম্ভীর মুখে সিগারেট ধরিয়ে খানিক বাদে আয়নায় মুখ দেখতে লাগলো। সমস্যা এখন, সেই মিলিওনিয়ার শিল্পপতি। ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদও বটে। ক্লারা জানে যে সে পশ্চিম জার্মানীর একজন বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে যুক্ত।

***

মঙ্গলবার ছাব্বিশে মে :

টুইড ওর অফিসের দোতলার ঘরে বসেছিল। অদূরেই রিজেন্টপার্ক। মোটা লেন্সের চশমা দিয়ে দেখছিল, চার্লস ওয়ার্নার-এর মৃতদেহটা থেকে লিন্ডাউ জলপুলিশ সবকিছু খুলে নিচ্ছে।

ব্রিটেনের গুপ্তচর সংস্থার কেন্দ্রস্থলটা ওয়াটারলু স্টেশনের একেবারে গায়ে কংক্রীট বিল্ডিং। ভেতরটা অবশ্য জর্জিয়ান বিল্ডিং-এর মত। বেশীরভাগ অংশই পেশাদার ইনটিটিটিউশনগুলোর এক্তিয়ারে আছে।

কিন্তু জায়গাটার একটা সুবিধে যে এই বিল্ডিং থেকে বাইরে এসে যে কোন দিকে চলে যাওয়া যায়।

কেউ অনুসরণ করছে কিনা সেটা দেখার সবচাইতে ভাল উপায় হল রিজেন্ট পার্ক। রিজেন্ট পার্কে নিজেকে লুকিয়ে রেখে কাউকে অনুসরণ করা একেবারে অসম্ভব।

খানিক এগোলেই রিজেন্ট পার্কের প্রবেশ পথ মাটির নীচে চলে গেছে। কেউ যদি এখানে অনুসরণ করতে চায় তাহলে তাকে লিফটে উঠতে হবে।

টুইড মৃদু স্বরে বলল, মানুষটা সঙ্গে কি বয়ে বেড়াচ্ছিল, সত্যিই মর্মান্তিক।

ও ছাড়াও ঘরে আরও একজন ছিল, নাম কেইথ মার্টেল। ও আপন মনে সিগারেট খাচ্ছিল। টুইড-এর মন্তব্যে ও খানিকটা অবাকই হলো।

ওদের দুজনের মধ্যে বয়সের ফারাকটা অন্ততঃ বছর বিশেকের। মারটেল লম্বা সুগঠিত চেহারার। চোখমুখে একটা দৃঢ়তার ভাব। জেদী স্বভাবের। বয়স ঊনত্রিশ। নাকের গঠন রোমানদের মত।

কালো রঙের হোল্ডারে পরপর সিগারেট খেয়ে যায়। কথা বলে জার্মান ভাষায়। এছাড়া ফরাসী ও স্প্যানিশ ভাষাতেও দক্ষ। হাল্কা বিমান ও হেলিকপ্টার চালানোয় পারদর্শী। সাঁতারও কাটে মাছের মত।

–স্বাভাবিক ভাবেই সবকিছু ঘটে। খারাপ হতেই পারে। এটাকেও ধরতে হবে বৈকি। ও বলে উঠল।

রহস্যময় স্বভাব, ওকে সঠিক আসনে বসিয়েছে। সমস্যা সমাধানে ওর খ্যাতি খুবই। কিন্তু ওর তীব্র আচরণেই ওকে এড়িয়ে নতুন একজনকে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রির প্রধান করা হয়েছে।নতুন সুপ্রীম ফ্রেডারিক অ্যান্টনী হাওয়ার্ড টুইডের সঙ্গে কিছু রহস্যাবৃত আলাপ হয়। তখন বেশ অপছন্দই করেছিল।

–এসব কি করে করলে কেইথ?

টুইড কাঁধটা ঝাঁকিয়ে ডেস্কের ফাঁকে ওয়ার্নার-এর জিনিষপত্রের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলো। মার্টেল কতকগুলো কাগজের টুকরো তুলে নিলো। তার মধ্যে কিছু টিকিটও আছে। সবগুলোই ওয়ার্নারের ওয়ালেটের মধ্যে থেকে পাওয়া গেছে।

ওয়ার্নারের ওয়ালেটে নানারকম অদ্ভুত সব জিনিসপত্র ভর্তি ছিল। সে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ছিল। মার্টেল জানে ব্যাপারটা মোটেই তুচ্ছ করবার নয়। ওয়ার্নার জানতো, তার যদি কিছু ঘটে বা সে যদি খুন হয়ে যায় তাহলে তার কাছ থেকে কোনরকম ক' যাতে কেউ না পায় সেরকমই করা উচিত।

–ও জার্মানীতে কি করত? মার্টেল জিজ্ঞেস করল।

–ঋণের ব্যাপারে জড়িয়ে ছিল। আমি এবং এরিখ স্টোলারও রয়েছে। এরিখের কাছে আমি সত্যিই ঋণী। ওর প্রয়োজন ছিল এমন একজন বাইরের লোক যে একজন জার্মানীকে ব্যাভেরিয়ার ডেলটায় ঢুকিয়ে দিতে পারবে। এটা নয়ানাজীদের ব্যাপার।ওরা খুব কৌশলেই নিজেদের আইনের ভেতর রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সেজন্যই ওদের ব্যান করা যায়নি।

বি. এন. ডি.এটা জার্মান নামের আদ্যক্ষর। এটি জার্মান ফেডারেল সিক্রেট সার্ভিস। এদের হেডকোয়ার্টার মিউনিখের কাছাকাছি। টুইড পকেট থেকে কিছু একটা বের

করতেই ডেস্কে পড়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হলো। ও সেটার দিকে তাকালো। অনেকটা ডেলটার মত দেখতে ত্রিভুজাকৃতি একটা রূপোর ব্যাজ।

–স্বস্তিকার আধুনিক সংস্করণ? টুইড মন্তব্য করলো। একটু ভেবে তারপর বলল, এই ব্যাজটা ওয়ার্নার-এর দেহ থেকে পাওয়া গেছে। খুনী অবশ্যই এটা না ভেবে-চিন্তে ফেলে দিয়েছিল।

কেমন করে ও খুন হলো?

খুবই নৃশংসভাবে। বলে টুইড নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। তারপর বললো, বি. এন. ডি. প্যাথোলজিস্ট-এর রিপোর্টে বলেছে, ওয়ার্নারকে এক বিশেষ ধরনের ছুরি দিয়ে পঁচিশবার ওর দেহে আঘাত করা হয়েছে। তারপর ওর দেহের পেছনে ওদের ট্রেডমার্ক ডেলটা' এঁকে দেয়।

–এই ডেলটার ব্যাপারটা আমরা ভাবছি...।

–এটা একজন নিরপেক্ষ সাক্ষী চিহ্নিত করেছে। তার নাম স্টোলার। এখনও আমার কাছে আসেনি ও। লিন্ডাউ-এর বন্দরে একটা উঁচু টেরাসে কিছু জার্মান ট্যুরিস্ট বসেছিল।

মার্টেল বলে উঠল, কিরকম যেন মনে হচ্ছে।

এরপর ও একটা জার্মান নাম উচ্চারণ করলো।

–হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি তো লিন্ডাউ বলে অদ্ভুত জায়গাট চেন। ম্যাপে জায়গাটা আমি দেখেছি। ওপর থেকে জায়গাটা ভেলার মতো দেখতে। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দুটো ব্রীজ দিয়ে যুক্ত রয়েছে...।

–একটা রোড ব্রীজ আর একটা রেল চলাচলের রাস্তা আছে। অবশ্য ওখান দিয়ে সাইকেল ট্রাকও যেতে পারে।

বাঃ, তোমার দেখার প্রশংসা করতে হয়। টুইডের বক্রোক্তি মার্টেল খেয়াল করলনা। টুইড তার প্রচণ্ড উদ্বেগ গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

–যা বলছিলাম..., একজন জার্মান ট্যুরিস্ট, ওয়ার্নার যখন বোট নিয়ে লেকে ঘুরছিল, তখ বাইনোকুলার দিয়ে ওকে লক্ষ্য করছিল। তারপর ও ছ’জন উইন্ড সার্কার’-কে এগিয়ে আসতে দেখল। ওয়ার্নারের কাছে এসে ওর পাওয়ার বোটটা থামালোবাইনোকুলার দিয়ে একভাবে দেখে যাচ্ছিল ও। ওয়ার্নার হুইলের কাছে দাঁড়িয়েছিল। বিপদ বুঝে সতর্ক হয়ে জলপুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। ওদের লঞ্চ টেরাসের নীচে।

এরপর ও স্টোলারের রিপোর্টটা দেখল। তারপর বলল, ডরনার তখন সমুদ্র দেখছিল...।

বাকিটা অতীত, দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস, তাই না?

–হ্যাঁ তাই। আমি চাই তুমি এবার এগোও।

***

ফ্রেডরিখ অ্যান্টনী হাওয়ার্ড কোনরকম শব্দ না করেই হাওয়ার মতো অফিসে এলো।

ওর সঙ্গে ম্যাসন ছিল। নতুন কাজে লেগেছে। ম্যাসনের চোখদুটো তীক্ষ্ণ আর ক্ষুধার্ত। ও চুপচাপ ওর চীফ-এর পেছনে অনেকটা কমিশনার-এর মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

–টুইড আমার মনে হয় তুমি জানো যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভিয়েনাতে কনফারেন্সে যাচ্ছেন সুতরাং ওর নিরাপত্তার জন্যে আমাদের সক্রিয় লোকের প্রয়োজন। তাই তো?

ও বলার সময় সক্রিয় কথাটার ওপর জোর দিল যার অর্থ মার্টেলকে রাখা যায় টুইডকে বাদ দিতে হয়। অসংযত মেজাজের হাওয়ার্ডের মুখটা চওড়া। বয়স পঞ্চাশ হলেও সুগঠিত চেহার ও অত্যন্ত কুশলী। মেয়েদের কাছে শয়তান বলে খ্যাতি আছে।

আসল কথা ওর স্ত্রী সিনথিয়া দেশের একটা ছোট কুঠুরিতে থাকে। ও নাইটব্রীতে পিয়েডএডেরা ভাড়া নিয়েছে। ওটাও খুব একটা সুবিধেজনক নয়। টুইড-এর ব্যক্তিগত মন্তব্য উচ্ছন্নে যাওয়ার ব্যাপারটা বোঝায়।

ঐ জায়গাটায় আমি একসময় ছিলাম। তাও সঙ্গে যখন মেয়ে আছে তখন একটা ঘর...

–এইগুলো কি? হাওয়ার্ড ওয়ালেটটা দেখতে দেখতে বলল। মার্টেল ততক্ষণে কাগজে টুকরোগুলো পকেটে পুরে নিয়েছে। হাওয়ার্ড ঘরে ঢুকে এল।

–হু। টুইড মৃদু হেসে বলল। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, চার্লস ওয়ার্নার-এর নিজস্ব ব্যাপার-স্যাপার সব। বি. এন. ডি. যদি দয়া করে মিউনিখ থেকে লন্ডনে আসে, তবে আমরা তদন্তের কাজটা তাড়াতাড়ি আরম্ভ করতে পারি।

টুইড চশমাটা খুলে মুখে আবার পরে নিল। হাওয়ার্ড-এর সামনে চশমা ছাড়া ওর অস্বতি হয়।

বুড়ো বয়সে আমরা একটুতেই রেগে যাই, হাওয়ার্ড হালকা মেজাজেই কথা বলল।

–লোকটা মৃত, টুইড আবার বলল।

–তোমার কাজ আমার পছন্দ হচ্ছে না। যতটা করেছ ততটাই ভাল। হাওয়ার্ড কথাগুলো বে জানলার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো।

–আমি জোর দিয়ে বলছি, আর এক সপ্তাহের মধ্যে প্যারিস থেকে ভিয়েনায় যে সমিট এক্সপ্রেস আসবে তাতে সক্রিয় কর্মীরা থাকবে। মঙ্গলবার দোসরা জুন...।

টুইড-এর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আমার কাছে ক্যালেন্ডার রাখবো।

হাওয়ার্ড প্রথমে টুইডকে ভুরু কুঁচকে তারপর মার্টেলকে দেখল। মার্টেল এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। চুপচাপ সিগারেট টানছিল। হাওয়ার্ডের উপস্থিতিতে কেউ এরকম অভ্যাস করে এটা হাওয়ার্ডের পছন্দ নয়।

–আচ্ছা। ও জোর দিয়ে বললল।

মার্টেল হাওয়ার্ড-এর দিকে কঠিন দৃষ্টি নিয়ে তাকালো।

–আমি অন্য জায়গায় ব্যস্ত, ও বলে উঠলো। হাওয়ার্ড টুইডের দিকে ফিরল, শীতল দৃষ্টি।

–এটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার। আমি মার্টেলকে আমার নিরাপত্তা বিভাগে নিচ্ছি। ও ভাল জার্মান...।

-কেন ও ব্যাভেরিয়া যাচ্ছিল। টুইড বলল, আমাদের বরাবরই সন্দেহ ছিল পৃথিবীর ঐ অংশে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে চলেছে। এখন বোঝা যাচ্ছে ওয়ার্নার খুন হল কেন?

হাওয়ার্ড ম্যাসনের দিকে তাকাতে দেখল ও যেন কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ করতে উদ্যত কমিশনারের মতো দরজায় দাঁড়িয়ে।

–আমি কি ব্যাপারটার একটু খোঁজ নিতে পারি?

বি. এন. ডি. এরিখ স্টোলার আর আমি নিজে। টুইড একটু জোর দিয়েই বলল কথাটা। হাওয়ার্ড'-এর কাছ থেকে এখন যাওয়া প্রয়োজন।

মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। ব্যাভেরিয়ান রহস্যের পুরো ভারটা আমি নিচ্ছি। আমি যেমন বুঝবো স্টাফকে নিয়ে পুরো ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করাবো। আর একটা ব্যাপার, সামিট এক্সপ্রেস ভিয়েনা থেকে চারজন উঁচু দরের পশ্চিমী নেতাদের নিয়ে আসছে। ব্যাভেরিয়া দিয়ে যাবার সময় ওরা কি সোভিয়েত ফার্স্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করবে?

***

ওরা আবার একা হয়ে গেল। মন্ত্রীদের বিশেষ আলোচনা শোনার জন্যে হাওয়ার্ড অফিস থেকে বেরিয়ে যেতেই ম্যাসনও নীরবে ওকে অনুসরণ করলো।

–আমার ব্যাপার ও মনে রেখেছিল, মার্টেল বলল।

–ঠিক আছে। কে?

–ঐ যে নতুন ছেলেটা, ম্যাসন। রাস্তা থেকে সে ওকে নিয়ে এসেছিল।

টুইড বলল, এক্স স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ। থামলো। আবার বলল, হাওয়ার্ড ওকে রীতিমত ইন্টারভিউ নিয়ে নিয়োগ করছে। আমার ধারণা ও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে আগে থেকে ওৎ পেতে ছিল।

–যে সব লোক আবেদন করেছিল তাদের আমরা নিইনি। মার্টেল হিসহিসিয়ে বলে উঠল।

–ওয়ার্নার এর হদিশ তুমি কিভাবে সংগ্রহ করছো? মন দিয়ে স্টোলার-এর লোকের তোলা এই ছবিগুলো দেখো। দুটোতেই ওয়ার্নারের পেছনে ডেলটা পার্টির প্রতীক পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে।

–ডেলটা অর্থাৎ নয়া নাজী।

মার্টেল ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলল, ডেলটা রেইনহাড় দিয়েত্রি নামে একজন মিলিওয়নার ইলেকট্রনিক্স শিল্পটি চালাচ্ছে। এছাড়াও ব্যাভেরিয়ান স্টেটের ইলেকশান অফিস চালাচ্ছে যা...।

–চৌঠা জুন, বৃহস্পতিবার, সামিট এক্সপ্রেস যেদিন ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করেছিল তার আগের দিন।

টুইড বলে উঠলো, একটা কিছু আছে যা দিয়ে হাওয়ার্ড-এর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। তুমি জান কেইথ, আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে, তা হলো সমস্ত ব্যাপারটার, পরস্পর সংযুক্তি–এক্সপ্রেস ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করা, স্টেট ইলেকশান, আমাদের কাছে পৌঁছবার আগেই ওয়ার্নারের খুন হওয়া। সমস্ত কিছু।

মার্টেল ডেস্কের ওপরে ছবিগুলো রেখে দিল। তারপর পকেট থেকে লুকানো কাগজের টুকরোটা বের করতেই হাওয়ার্ড ঘরে ঢুকল। ও ওটা লুকিয়ে ফেলেছিল।

জুরিখ থেকে আরম্ভ করবো। কি কারণে ওয়ার্নার খুন হলো এটা বের করতে হবে।

জুরিখ কেন? আমি তো তোমাকে দেখয়ে ছিলাম মিউনিখ থেকে জুরিখের একটা প্রথম শ্রেণীর টিকিট আর লিন্ডাউ থেকে মিউনিখ। কিন্তু...।

–হু, এই ছেঁড়া কাগজের টুকরো। চালিয়ে যাও। লক্ষণ ভালই।

টুইড আতস কাঁচ দিয়ে টুকরোটা ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলো। এই টিকিটে প্রিন্ট করা আছে, লিজেন্ড ভি, বি. জেড. জুরি...লিনি। বেগুনীঅংশটায় রেনওয়েগ–আগস্টশব্দগুলো পাঞ্চ করা আছে। দামও লেখা আছে।

–প্রথমবার যখন আমি জুরিখে ছিলাম, আমি নিশ্চিত যে, তোমার কাছে একটা ট্রামের টিকিট ছিল। মার্টেল বলল, ট্রামের রুটটা ছিল বনহফট্র্যাসি থেকে রেনওয়েভা। হু, ওয়ার্নার শহরের ভেতরে কেন ঘোরাঘুরি করছিল? কোথায় যাচ্ছিল? ও তো সময় নষ্ট করার লোক নয়।

টুইড ওর কথায় ঘাড়টা নাড়লো। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা ফাইলের ভেতর থেকে ছোট্ট কালো নোটবুক বের করল। ওর একটা পাতায় আঙুল টিপে ধরে ড্রয়ারের চাবিটা দোলাতে লাগল।

আমার ধারণা তুমি জান যে হাওয়ার্ড, যতক্ষণ না সবাই বাড়ি যায়, বসে থাকে, তারপর ও ভ্রমণে বেরোয়। ভেবেছিল কিছু একটা পাবে যা ওকে বলা হয়নি। ও নিজের স্টাফ-এর পেছনেই : গোয়েন্দাগিরি করতে বেশী সময় দেয়। তারপর অপর পক্ষের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করে। ওর হাত শক্ত রাখতে ব্যাপারটা...।

–তুমি সব চাইতে দামী কাজটা করে ফেলেছ।

মার্টেল বলে উঠলো, অনুমানটা দারুণ। আমি কি তুরুপের তাসটা দেখতে পারি?

ওয়ার্নার-এর ব্যাপারে স্টোলার দ্রুতবেগে আমার কাছে এগিয়ে আসছে। টুইড ছোট নোটবুকটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলে উঠলো, একমাত্র আমিই জানি ওয়ার্নারের কাছে দুটো নোটবুক থাকত। বুকপকেটের ভেতর যে বড় নোটবুকটা থাকতো ওটা পাওয়া যাচ্ছে না। যে বদমাইশটা ওকে আঘাত করেছিল, সেই ওটা হাপিস করেছে। অর্থহীন সব ব্যাপার। ব্যাটা গোপন পকেটে রেখেছিল। স্টোলার লিভার থেকে যখন আসছিল তখন ও নিজে দেখেছে। এর আগে জলপুলিশের ডরনারের কাছে সব শুনেছিল।

–আমি কি ওটা একটু দেখতে পারি?

–তোমার জিভটা খুবই ধারালো, বলে টুইড নোটবুকটা ওকে দিলো। মার্টেল পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কতগুলো খাপছাড়া টাইপের শব্দ দেখতে পেল। মিউনিক, জুরিখ, ডেলটা, ওয়াশিংটন ডিসি, অপারেশান ক্রোকোডাইল প্রভৃতি।

চার্লস...?

–ওরা সবাই ওয়ার্নারকে চার্লস বলে। মনে হচ্ছে চার্লস মেইন স্টেশনগুলিতে ছিল। হাউপটব্যানহফ...মিউনিক...জুরিখ। কেন? যদি জুরিখের সঙ্গে ডেলটা'র কোনরকম সম্পর্ক থাকে তাহলে অদ্ভুত ব্যাপার কোষ্টা? বলতে পারো?

টুইড বলে উঠল, ডেলটা হচ্ছে অফিসিয়াল নয়া-নাজী পার্টি। এদেরই প্রার্থী ব্যাভেরিয়ান স্টেট ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছে।

কিন্তু এরা আন্ডার গ্রাউন্ডেও কাজ করে। একটা গুজব আছে ডেলটা দলগুলো উত্তর-পূর্ব সুইজারল্যান্ডে অপারেশন চালাচ্ছে; সেন্ট গ্যালেন আর অস্ট্রিয়ান বর্ডার-এর ঠিক মাঝখানে ওদের কারবার। সুইস কাউন্টার এসপিয়নেজ দার্দি অ্যান্ড ব্যাপারটায় বেশ চিন্তিত...।

আমাদের সমর্থন করাটাই অনেক? দিচ্ছে? মার্টেল জিজ্ঞেস করলো।

–খুব সতর্কভাবে। সুইস পলিসি তুমি তো জানো? নিরপেক্ষ থাকতে চায়। সেজন্য ওরা খুব সাবধানে...।

ঐখুনেগুলো ওয়ার্নারের কি করলো দেখ। আর এই ক্লিন্ট লুসিসটা কে? ওয়াশিংটন ডি. সি.?

টুইড ঘোরানো চেয়ারটাকে আস্তে আস্তে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, ক্লিন্ট আমার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু, প্রাক্তন সিয়া। পরে টিম ও'মিয়েরা ওকে বার করে দিয়ে নিজেই এখন সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান হয়েছে। সুতরাং মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামিট এক্সপ্রেসে ভিয়েনা যাত্রার কোন নিরাপত্তা রইল না।

–হাওয়ার্ড যদি এর বিপক্ষে থাকে তাহলে বি.এন. ডি-র সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে ফান্ডের বেশীরভাগটা কে দেবে?

–বি. এন. ডি-র এরিখ স্টোলার। প্রচুর পয়সাওয়ালা লোক ও। ডেলটা একটা ক্ষতচিহ্ন...।

–তাহলে চার্লস যেরকম গোপন স্বভাবের, সেই রকমই তোমাকে না জানিয়ে মিউনিক থেকে ওয়াশিংটনে দ্রুত...।

ওকে থামিয়ে দিয়ে টুইড সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, হ্যাঁ। আমিও তাই মনে করি, কিন্তু কেন, বুঝতে পারছি না।

–কিন্তু আমরা তো অন্যকিছু বুঝে উঠতে পারছি না। তাই না?

ওয়ার্নারকে যে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে এতে দেখাই যাচ্ছে।

কথাটা বলে নোটবুকটা দেখতে দেখতে বলল, সেন্ট্রালহক। ই দেখা যাক্।

চেয়ারে বসা টুইডের দৃষ্টি চশমার মধ্যে নির্লিপ্ত। এর অর্থ মার্টেল জানে যে, এখন ও এমন কিছু বলতে যাচ্ছে যা ও পছন্দ করেনা। একটা সিগারেট ধরিয়ে হোল্ডারটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরল।

টুইড স্বাভাবিক ভাবেবলল, তুমি এই ব্যাপারটায় আমাকে কিছু সাহায্য কর কেইথ।ওয়ার্নারকে জীবিত দেখেছে যে সেই শেষ ব্যক্তি হচ্ছে ফার্ডি আর্নল্ড ও আমাদের খুবই সাহায্য করেছে।

–ও অর্থাৎ মহিলা?

–হুঁ, মহিলা। ক্লেয়ার হফার। ও থাকে জুরিখে। মেয়েটার মা ইংরেজ বাবা সুইস। ও সুইস সার্ভিসে যোগ দিয়েছিল। সেন্ট্রালহক ৪৫। সুতরাং রেফারেন্স থেকে অনুমান করা যায়...।

-মনে হচ্ছে ওয়ার্নারের নোটবুক রাখার কারণ হচ্ছে ওর সন্দেহজনক ব্যাপারগুলো...।

তুমি যা সাহায্য পেয়েছ সব কিছুই প্রয়োজনে লাগতে পারে...।

–সমস্ত সাহায্য আমি বিশ্বাস করতে পারি...।

টুইড একটু জোর দিয়েই বলে উঠলো, মেয়েটা একটা প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

ব্যাপারটা বোঝ...। মার্টেল বলে উঠলো, ওয়ার্নারকে এমন কেউ খুন করেছিল যাকে ও বিশ্বাস করেছিল এবং সে জানত ও সুইজারল্যান্ড অতিক্রম করছে।

একটু থেমে আবার বলে উঠল, এখন তুমি আমাকে আবার বললো যে, কেউ স্টোলার বাইরের সাহায্য চেয়েছে।

কারণ ওভাবে, বি. এন. ডি ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। যেখানেই তুমি যাও না কেন সব জায়গাতেই একটা সন্দেহের মেঘ। দোসরা জুন, মঙ্গলবার, রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশে সামিট এক্সপ্রেস প্যারিস ছাড়ছে। আর সাতদিনে, রহস্য ভেদ হচ্ছে।

***

বুধবার, সাতাশে মেঃ

জেনেভাগামী মিঃ কেইথ মার্টেলকে অনুরোধ করা হচ্ছে তিনি যেন তাড়াতাড়ি সুইস এয়ার রিসেপশনে ডেস্কে চলে আসেন...।

ট্যানর থেকে খবরটা এলো। মার্টেল হিথরো বিমানবন্দরের লাউঞ্জে ছিল। যাবার সময় হয়ে এসেছে। ঠিক সেই সময় খবরটা শুনে ও আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামলো। ওখান থেকে সুইস এয়ারের রিসেপশন ডেস্ক দেখা যাচ্ছে। ওখানে আরো দু'জন যাত্রীকে ডাকা হলো। ও উল্টোদিকে যাচ্ছিল।

সুইস এয়ার হোস্টেস তাকে জরুরী ফোন আসার খবরটা জানাতেই ও এগিয়ে গিয়ে রিসিভার ধরতেই মেয়েটা সামনে থেকে চলে গেল।

টুইডের ফোন, কণ্ঠস্বরে সতর্কতা। প্রাথমিক পরিচয়পর্ব সেরে মার্টেল কাজের কথায় এলো।

-কি ব্যাপার? তুমি আমার নাম ব্রডকাস্ট করেছ। এই টার্মিনালের প্রত্যেকটা হারামজাদা আমার নাম জেনে গেল...।

–আমি জেনেভায় যাওয়ার ব্যাপারটা পাল্টেছি। ওখানে কে...।

–অনেক ধন্যবাদ। আর দশমিনিট বাদে আমার ফ্লাইট...।

–আরে গতকাল যখন আমরা কথাবার্তা বলছিলাম তখন আমার অফিসে ছারপোকা ছিল।

–তুমি কোথা থেকে বলছ?

–বেকার স্ট্রীট স্টেশনের একটা বুথ থেকে। বিল্ডিং থেকে কথা বলার মতো বোকা আমি নই। পরিষ্কার করার মেয়েটা আমাকে জানালো আমার লাইটের বাটা গেছে। আমি ওটা চেক করতে গিয়ে হঠাৎই দেখি তখন শেডের ভেতর ছারপোকা...।

–তাহলে তো আমাদের কথা কেউ শুনেছে।

–টেপ করেও নিয়েছে। এটাও জেনেছে আমি কোথায় যাচ্ছি আর কেন যাচ্ছি।

–আমি ভেবেছি তোমার প্লেন ধরার আগেই এটা জানান উচিৎ–টুইডের গলা দিয়ে একধরনের শব্দ বার হলো আর কণ্ঠস্বরে আবেগ।

ধন্যবাদ, আমি আমার চোখ খোলা রাখব,মার্টেল ছোট্ট জবাব দিল।

–সম্ভবতঃ জুরিখ-এ তোমার সতর্ক থাকা উচিৎ। একটা রিসেপশান কমিটি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে...।

অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমাকে যেতে হবে...।

***

এগারোটা দশে সুইস এয়ার ফ্লাইট ছাড়ল। লন্ডনে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রীফারেনহাইট। মার্টেল জানলার ধারে একটা সীটে বসেছিল। জানলা দিয়ে জারা পর্বতের শৃঙ্গগুলো দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন ওগুলো ছোঁয়া যাবে।

প্লেন প্রথমে ব্যাসলের ওপরে এসে পৌঁছলো তারপর জুরিখের উদ্দেশ্যে পূর্বদিকে উড়ে চললো।

মেসিনের শব্দ হওয়ার সময় জানলার অপর প্রান্তেবরফে ঢাকা আল্পস-এর ওপর সূর্যের আলো পড়ে এক মনোরম দৃশ্য তৈরী করেছে। অবশেষে প্লেন নামলো।

ক্লেটেন এয়ারপোর্ট। জুরিখের দূরত্ব এখান থেকে দশ কিলোমিটার। প্লেন থেকে বেরোতেই উত্তাপের ঝলকানি ওকে গ্রাস করলো। লন্ডনে পঞ্চাশ ডিগ্রী আর জুরিখে পঁচাত্তর ডিগ্রী ফারেনহাইট। এয়ারপোর্ট সুশৃঙ্খল আর শান্ত। কাস্টমস্ আর পাসপোর্ট কন্ট্রোল অতিক্রম করতে ওর রীতিমত সমস্যা দেখা দিলো।

এয়ারপোর্ট থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে ওকে হাউণ্ট ব্যানহক-এর দিকে যেতে হবে। যেটা ওয়ার্নার-এর নোটবুকে লেখা দ্বিতীয় জায়গা। ট্রেনের বদলে ও একটা ক্যাব' এ উঠলো।

সুইজারল্যান্ডের তিনটে বড় হোটেল-এর মধ্যে একটাতে ও উঠলো। ঘরের ভাড়া হাওয়ার্ডকে সন্ন্যাসী বানিয়ে দেবে। কিন্তু হাওয়ার্ড খরচ-খরচা দেয়নি। লন্ডন ছেড়ে যাবার আগে টুইডকে অনেকগুলো জিনিস টেলেক্স করলো। এতে এরিখ স্টোলারও আছে।

জার্মানরাই তোমার খরচ বহন করছে। সুতরাং মেজাজে উপভোগ করেনাও,টুইড বললো। একটু থেমে আবার বলল, সমস্ত ঘটনার ব্যাপারে ওরা সচেতন। ওরা জানে যে, এমন লোককে আমি সাহায্যের জন্যে পাঠিয়েছিলাম, সে আর নেই...।

–সেজন্য আমি পরবর্তী লোক হতে পারি? মার্টেল উত্তর দিলো, যাক ভালোই। ছোট্ট ঘরের থেকে শহরের ভাল জায়গাই পাওয়া যাবে...।

ভাল? উদাসীন ভাবে শব্দটাকে ভাববার চেষ্টা করল ও।

ক্যাব দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে জুরিখের দিকে। ভাবতে লাগল টুইডের অফিসের ছারপোকার কথা, ওর হোটেল পরিবর্তন করা উচিত। বিরোধীরা যদি ওকে বাউর-অ্যাল্যাক'-এ খোঁজার চেষ্টা করে তাহলে ওর কাছে একটা দারুণ সুযোগ আসবে। প্রথমে তো ওদের সঙ্গে দেখা হোক। মার্টেল একটা সিগারেট ধরালো।

জুরিখে ফিরে যাওয়াই ভাল। নীলরঙের ট্রামগুলো শব্দ করতে করতে চলে যাচ্ছে। ড্রাইভার ওকে ব্যানহকপ্লেটজ-এর দিকে নিয়ে চলল। যেতে যেতে লিমাট নদী বয়ে যাচ্ছে দেখতে লাগল মার্টেল। একটা ব্রীজ পড়ল এই নদীর ওপর। ওয়ার্নারের নোটবুকে কেন জায়গাটার নাম লেখা আছে এই ভেবে খুব আশ্চর্য হল আর ভালভাবে জায়গাটা দেখতে লাগলো।

বাঁদিকে সারি সারি গাছ। ইউরোপে এটাই ওর প্রিয় শহর আর এই রাস্তাটা। এখানে বেশ কয়েকটা বড় বড় ব্যাংক আছে, যাদের আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্টগুলোতে জমানো সোনার পাহাড়। প্রত্যেকটা ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন।

আস্তে আস্তে গাড়ি ট্যালটেলীর রাস্তায় এসে পড়ল। দুরে রাস্তার শেষপ্রান্তে বাউর-আ-ল্যাক' দেখা যাচ্ছে। সামনে লেক।

ধূসর মেঘে ঢাকা আকাশ। আবহাওয়াটা গুমোট। শহরটা যেন বিপদে মেখে আছে। ধনুকের মত এক জায়গায় ক্যাবটা এসে থামল। সামনের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতেই হেড পোর্টার দরজা খুললো। মার্টেল দেখল একটা রোলস রয়েস আর পাঁচটা মার্সিডিজ পার্ক করা রয়েছে। প্রবেশ পথের ঠিক পেছনে সবুজ লন, ছোট্ট পার্কও বলা যায়।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল পর্যন্ত ওকে কেউ অনুসরণ করেনি। এ ব্যাপারে ও নিশ্চিত। হোটেল প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। হেড পোর্টার ওকে দেখে ভ্রু কুঁচকে ফোনটা তুলে কিছু কথাবার্তা বলে অবশেষে ওকে একটা ডাবল বেডের ঘর দেওয়া হল। ঘরে পৌঁছে বেডরুম এবং বাথরুম ভালভাবে পরীক্ষা করে নিল কোন মাইক্রোফোন লুকনো আছে কিনা। যাইহোক কিছুই পাওয়া গেল না। ও কিছুতেই যেন সন্তুষ্ট হতে পারছিল না।

লিফট এড়িয়ে ও সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। লিফটে না চড়াই ভাল, ওটা একটা ফাঁদ। আবহাওয়া, স্বাভাবিক। খানিকটা এগোতেই দেখল একটা চাদোয়ার তলায় চা আর ড্রিংকস পাওয়া যাচ্ছে। পাশের ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্টে ও কফির অর্ডার দিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে সামনে এলিটদের আসা যাওয়া একভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো। একটা ছায়া ওর সামনে ভেসে উঠলো।

ক্লেয়ার হারের সঙ্গে ঠিক রাত আটটায় ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, ওরই ফ্ল্যাটে। কিন্তু সময়টা এত বিশ্রী যে ও খানিকটা বিরক্তি বোধ করলো। স্বাভাবিক হলে জায়গাটা ও তন্ন

তন্ন করে খুঁজে নিতে পারত। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। টুইডের অফিসের ছারপোকার ওপরে ও নিজের কৌশলে খানিকটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ও ভালভাবেই অপেক্ষা করতে লাগল।

অন্যেরা যখন রাতের খাবার খেয়ে নিচ্ছে ও তখন কফি খেল সাড়ে সাতটা নাগাদ। তারপর বিলে নিজের সই আর রুম নাম্বারটা লিখে ধনুকাকৃতি জায়গাটায় এসে দাঁড়ালো। কাউকে দেখতে না পেলেও ওর মনের অস্বস্তি কিছুতেই যাচ্ছে না।

রাস্তা ফাঁকা, জনমানবহীন। ও মেসিনের কাছে গিয়ে ওটাকে থামিয়ে কুড়ি সেন্টিমের একটা মুদ্রা ঢুকিয়ে দিল আর টিকিটটা নিয়ে জুরিখের একটা গোপন লোকের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ট্রামগুলো ওর চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। টিকিটটা ওকে খানিকটা ঝামেলায় ফেলছিল। ওর বুকপকেটে একটা খামের ভেতর ওয়ার্নারের ওয়ালেটের সবকিছু আছে। ওর সঙ্গেই ট্রামের টিকিট আছে, তাতেও লেখা রেনওয়েগ–আগস্ট। জায়গাটা বেশীদূর নয়। ক্লেয়ার হফারের মুখটা মনে পড়তে সামনে দিয়ে আসা ট্রামটায় উঠে নামবার দরজার দিকে ঠিক পাশের সীটটায় বসে পড়ল।

হোটেল থেকে সেন্ট্রাল হক ৪৫এ আসতে মিনিট পাঁচেক লাগে। এখানেই ক্লেয়ার হফারের ফ্ল্যাট। ট্রামটা একটা স্টপ এগোতেই ওর মনে হলো কেউ যেন অনুসরণ করছে। পরের স্টপটায় উঠে দাঁড়ালো আর ট্রামটা থামলে একটা কালো বোম টিপল, তাতে দরজা দুটো আপনা হতেই খুলে গেল।

দরজা খুললো। নিজের টিকিটটা দেখে নিয়ে ও সামনের দিকে তাকালো। গন্তব্যস্থল সম্পর্কে এখনো ও কিছুটা বিভ্রান্তিতে ভুগছে।

কিছু লোক ট্রাম থেকে নামল। দরজা বন্ধ হতে আরম্ভ হল। ও লাফিয়ে ফুটবোর্ডে পা রাখলো। ও জানে ফুটবোর্ডে কেউ থাকলে দরজা হয় খুলে যাবে নয়তো খোলাই থাকবে।

এবারে পাশে নেমে ও খানিকটা দাঁড়ালো।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেউ ওকে অনুসরণ করছে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হলো। ট্রামের দরজা আবার আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল এবং ট্রাম নিজস্ব গতিতে চলতে লাগল।

সেন্ট্রালহক জায়গাটা অনেকটা চতুর্ভুজের মত। একদিকে বনহফট্রাসে আর চারদিকে বড় বড় বিল্ডিং। এই চতুর্ভুজের প্রত্যেক দিকের সামনেটা ধনুকের মত। প্রত্যেকটা দিকেই প্রবেশ পথ আছে। একটায় বনহফট্রাসে। ভেতরে বাগান।

মার্টেল দ্রুত রাস্তাটা পার হলো। পোট্রোট্যাসের দিকে এগিয়ে ডান দিকে পাশাপাশি ব্লকের তৃতীয় দিকে এগোতে লাগলো। ধনুকের মতো জায়গাটা হেঁটে যাবার সময় গাছগুলো, গাছের মূলগুলো ভাল করে দেখতে লাগল। ওর আগের কথা মনে পড়ল। সবকিছু একই আছে, পাল্টায়নি কিছুই। ও একটা সীটে গিয়ে বসলো।

সেন্ট্রালহকে এই অ্যাপার্টমেন্টটায় ও আগে কখনও আসেনি। ঢোকার সময় কৌশল নিল। এমনভাবে দাঁড়ালো যাতে বাইরে ওর ছায়াটা দেখা যায়, সেভাবে দাঁড়ালো। তাহলে অনুসরণকারীকে ধরে ফেলা সহজ হয়।

জায়গাটা আলোআঁধারি। কেমন যেন সব অস্পষ্ট। সামনে গাছগুলোতে পাখীদের কিচিরমিচির আর ঝর্নার কুলকুল শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এর থেকে শান্ত পরিবেশ আর হয়না। সামনের জানালা, তার পাশের জানলাটার দিকে ও তাকালো। তারের পর্দা দিয়ে জানলাগুলো ঘেরা। হঠাৎ একটা শব্দ হলো।

না। শান্তির মরূদ্যানে ওকে কেউ অনুসরণ করতে আসেনি। এবারেও উঠে দাঁড়িয়ে ধনুকাকৃতি জায়গাটার দিকে এগোতে লাগল। অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার প্ল্যানটা টুইড ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

সামনে দেখল নেমপ্লেট–সি. হফার। বেলটা টিপতেই জার্মান ভাষায় একটা মহিলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ভাষাটা সুইস-জার্মান নয় বলে ও ঠিক বুঝতে পারল না।

–কে ওখানে?

–মার্টেল। কণ্ঠস্বরটা যথাসম্ভব নরম রেখে বলল। চোখদুটো গ্রীলের দিকে।

অপরপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল–আমি ক্যাচটা খুলে দিয়েছি। দোতলায় আছি।

দরজা খোলার পর আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে গেল। পেছনের দরজাটা আপনা হতেই বন্ধ হয়ে গেল। সামনে পুরোন আমলের লিফট। লিফটেনা উঠেও বেশ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি।

ওজন নয় স্টোন দুই পাউন্ড।

বয়স-পঁচিশ।

চুলের রং কালো।

চোখের রং–ঘোর নীল।

হফারের বর্ণনা মোটামুটি এইরকম।

টুইড মার্টেলকে লন্ডনে এটা আগে থেকেই দিয়েছিল। ফার্ডি আর্নল্ড-এর দেওয়া তথ্য ওগুলো। ও জানে যে, টুইডের দুটো ব্যাপারে ঘৃণা আছে। একটা কমন মার্কেট আর একটা মেট্রিক সিস্টেম।

মার্টেল দোতলায় পৌঁছল। ওর কাছে কোনো রকম অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। ও আশা করেছিল যে হফার একটা হ্যান্ডগান অন্ততঃ দেবে। ওর সামনে বন্ধ দরজার কাঠের কাজগুলো ভারী অদ্ভুত। মাঝখানে একটা ছোট্ট গর্ত। বোঝা গেল মহিলাটি প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

–জুরিখে স্বাগতম। মিঃ মার্টেল তাড়াতাড়ি ভিতরে এসো।

তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে গেল। ও ভেতরে ঢুকতেই মহিলাটি ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলো। তারপর দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল।

ধনুকের মত জায়গার নীচে ও অপেক্ষা করতে লাগল। ওর আঙুলের মাঝখানে কালো হোল্ডার ধরা আছে। নির্লিপ্ত ভঙ্গীমায় ও মহিলাটিকে দেখতে লাগল।

মেয়েটার চোখে বড় আকারের বিদেশী কালো চশমা। মহিলার চুলগুলো ঘন কালো। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি, ওজন নয় স্টোন। সমস্ত কিছু মিলিয়ে মহিলাটি আকর্ষণীয়া। রঙীন ব্লাউজ আর স্কার্টে দেহটা আবৃত। রুক্ষ স্বরে মহিলাটি বলে উঠলো, সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?

–তুমি আর একটু সতর্ক হতে পারো না? মার্টেল বলল।

ছোট্ট হল ঘরটা থেকে বেরিয়ে ওরা একটা বসার ঘরে পৌঁছল।

–এখান থেকে জানলা দিয়ে সেন্ট্রাল হক' এর বাগানটা দেখা যায়। কথাটা বলে মার্টেল সিগারেট ধরালো মহিলাটির অনুমতি না নিয়েই।

মহিলাটি গম্ভীর হয়ে বলল, তুমি অবশ্য এখানে সিগারেট খেতে পারো।

–চমৎকার। আসলে এটা না খেলে কোন কিছুতেই আমার মনোযোগ আসে না। এরপরে ও ঘরটার চারিদিকে ভালভাবে তাকাতে লাগল। বেশ কয়েকটা আর্ম চেয়ার আর সোফা

রয়েছে। এছাড়া স্বাভাবিক ওজনের সাইনবোর্ডও আছে। এই জার্মান-সুইসের ঘরের আসবাবপত্র দেখে ওর একগুয়ে মেজাজেরই পরিচয় দেয়।

মার্টেল ভাবল, হফার এই মুহূর্তে কি ভাবছে ও জানে। ও ভাবছে হায় এই বদমাসটার সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হবে?

-আমি এক্ষুনি একটু কফি নিয়ে আসি। ও বন্ধুত্বপূর্ণ গলাতেই বলে উঠলো।

–তাহলে তো ভালই হয়...।

মার্টেল জানলার দিকে এগিয়ে গেল। মহিলাটি সুইংডোর দিয়ে জানলার দিকে চলে গেছে।

তাড়াতাড়ি দেখলে মনে হয় বেশ দামী জিনিষে ভর্তি। ও গতি পরিবর্তন করে আস্তে আস্তে দরজার হাতলটা ঘোরাল। দরজা খুলে যেতে ভেতরটায় ও উঁকি মারল।

সামনেই বেডরুম। একটা বড় বেড, একটা ড্রেসিং টেবিল রয়েছে। চারিদিকে পরিচ্ছন্নভাবে কমেটিক সাজানো। একটা বড় আকারের ওয়ারড্রোব। দরজা অর্ধেক খোলা রেখে সরে এলো।

রান্নাঘরের মধ্যে হঠাৎ ও এসে দেখল পারকোলেটারে কিছু একটা করছে। কাউন্টারে কিছু আধ-খাওয়া খাবার পড়ে আছে। পাশে একটা অপরিষ্কার গ্লাস। এছাড়া অপরিষ্কার

একটা ছুরি, দুটো কাঁচি, এক টুকরো স্টিকিং প্লাস্টার এসবও রয়েছে। মুখ বন্ধ অবস্থায় ও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বাড়িতে এসবও করো, মার্টেল...।

–সব সময়েই, বলে মৃদু হাসল। তারপর হপারের দিকে তাকিয়ে বলল, ওয়ার্নার কি এখানে ঘুমোতো?

কথাটা শুনতেই হপারের পারকোলেটার থেকে জিনিস ছিটকে পড়ল। হপার দেওয়ালের কাপবোর্ডের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওটা খুলল।

জীবনের একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে আমি অনেককিছু পাল্টাই...। ওখান থেকেই মহিলাটি বলে উঠল। তারপর পরের বোর্ডটা থেকে বড় বড় কটা কফির কাপ বের করল। মার্টেল ক্রীম খাবে না জেনে হফার দুটো কাপে কালো কফি ঢাললো।

তারপর ওগুলো একটা প্লেটে রেখে মার্টেলের দিকে তাকিয়ে বলল–তুমি আমাকে...।

অনুমতি দিচ্ছো...।

এরপর কাপ দুটো তুলে নিয়ে মার্টেল বসার ঘরের দিকে এগোলো। ঘরের মধ্যে মাদুর ঢাকা একটা টেবিল দেখল। হফারকে অনুসরণ করল।

ওরা পরস্পর কথা বলছিল। হফার কালো চশমার ফাঁক দিয়ে শোবার ঘরের দিকে তাকালো। মার্টেল ওর চোখের ভাষা বুঝল না। কিন্তু মুখের বিবর্ণ ক্ষতটা দেখা যাচ্ছিল।

–তুমি বেডরুমে...

–আমি কারো সঙ্গে থাকাটা...।

–তোমার নার্ভ আছে বলতে হবে।

ওরা দু'জনে বেডরুমের দিকে এগোতে থাকল। মার্টেল হারের হাতটা ধরে শোফায় গিয়ে বসল পাশাপাশি একটা হাতে হারের বাহু আর সেই বড় গ্লাসটা নিলো।

হফার হঠাৎ অন্য হাতে ওর বড় বড় নখ দিয়ে মার্টেলের মুখে আঘাত করল। মার্টেল কব্জি ধরার চেষ্টা করল।

হিসহিস শব্দে হফার বলে উঠল, মার্টেল বুঝছো তো। আমরা যদি পরস্পর কাজ করি তাহলে কিছু ব্যাপারে আমাদের সোজাসুজি হওয়া দরকার...।

–তুমি এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। ওয়ার্নার আর তোমার ব্যাপারটা।

কিছুক্ষণ বাদে হফারকে ছেড়ে দিয়ে কফিতে চুমুক দিল। একভাবে হারের দিকে তাকিয়ে রইল। হফারও স্বাভাবিক হয়ে কফিতে চুমুক দিলো।

–শোনো কয়েকটা ব্যাপার আছে। প্রথমতঃ তোমার এক্তিয়ারে ওটা পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ আমার উত্তর না'না। আমি যতটুকু ওকে জানি ও আমার কাছে সব সময় থাকতো না। ব্যাপারটা কঠোরভাবেই ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ...।

ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার। যাইহোক আমার কথা শোন। ওয়ার্নার খুন হবার আগে শেষ কবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

লিন্ডাউ-এ যাবার দিন তিনেক আগে। ওকে দেখে আমার খুব হতাশ মনে হয়েছিল বলেছিল ওর মনে হচ্ছে সব জায়গায় যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়...।

–ডেলটার সঙ্গে?

ক্লেয়ার হফার খানিকক্ষণ থামলো। মার্টেল ভাবলো ও কি ভাবছে তা যদি হফার বুঝতে পারে তাহলে ও অবাক করে দেবে। টুইডের মন্তব্য ওর মনে পড়ছিল যে, ব্যাপারটা মিথ্যে কখনই নয়। যদি ঘটনা তোমার চিন্তার সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে, তাহলে ঘটনাকে সব সময় বিশ্বাস করবে।

টুইড মার্টেলকে এটা বারবার বলেছিল।

হফার-এর উত্তরে মার্টেল সেটাই ভাবলো।

তুমি ওদের নয়া-নাজী পটভূমির কথা বলছো? আমি ডেলটার কথা বলছি যার সঙ্গে ও চলছিল।

মার্টেলকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে শান্ত কিন্তু ওর নার্ভগুলো ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত। প্রাণপণে উত্তেজনা থামাবার চেষ্টা করতে লাগল।

হফার এক নাগাড়ে কফি খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। যখন মার্টেলকে অনুসরণ করে ও রান্নাঘরে এসেছিল তখন একটা ব্যাগও সঙ্গে এনেছিল। সেটা জানালার ধারের সোফার পেছনের চেয়ারে ফেলে এসেছে। কথা বলতে বলতে ও সোফার দিকে এগিয়ে এলো।

ও আমার কাছে একটা নোটবুক ফেলে রেখে গিয়েছিল। তাতে তো অনেককিছুই লেখা আছে কিন্তু ডেলটার কথা কিছু ছিল বলে তো মনে পড়ছে না...।

মার্টেল আধখোলা শোবার ঘরের কাছ থেকে অস্পষ্ট, অদ্ভুত ধরনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। হফার ব্যাগটার মুখটা খুলতে খুলতে ওর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল।

–পরের দরজার লোকগুলো উৎপাত করছে। ঘরগুলো পরিষ্কার করার আগে এরকম করছে। যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে এরকম চলবে।

মার্টেল বসার জন্যে সোফাটাই বেছে নিয়েছে। কারণ ফায়ার প্লেসের ওপরে একটা আয়না আছে। তার সামনেটায় একটা বড় ফুলদানী। কিন্তু হফারকে এখান থেকে ভালই দেখা যাচ্ছে।

যখন ও সতর্কভাবে ভেবে দেখছিল যে ওকে কেউ অনুসরণ করছে না তখনই ও শোচনীয় একটা ভুল করে বসেছিল। ওর সামনেই বিপদ, পেছনে নয়। অ্যাপার্টমেন্টে ওর পৌঁছনোর জন্যেই শত্রু অপেক্ষা করছে।

তুমি এলে যখন তখন আমি একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলাম, এজন্য আমি দুঃখিত। আসলে চার্লির মৃত্যুটা আমাকে ভীষণ আঘাত দিয়েছে...। এরপরে মার্টেল ক্লিক ধরণের

একটা শব্দ শুনতে পেয়ে বুঝতে পারলো হফার ওর পেছনে আসছে। আয়নার সামনের ফুলদানীটার কাছে এসে দাঁড়ালো। দু'জনের দূরত্ব বেশী নয়। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মার্টেল ঘুরে দাঁড়িয়ে হারের কজীটা ডানহাত দিয়ে চেপে ধরলো। ওর হাতে ফেল্ট-টিপ' ধরনের পেন-এর মতো একটা জিনিস ছিল।

আসলে ক্লিক শব্দটা হতেই ওটার ভেতর থেকে ব্লেডের মত লোহার শিক বের হয়ে এসেছিল। একেবারে গোড়াটা সূঁচের মত পাতলা। হফার ঐ সঁচের মত জায়গাটা ওর ঘাড়ের মাঝখানে চেপে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল।

মার্টেল নৃশংসভাবে ওর কজীটা মুচড়ে দিল। হফার আর্তনাদ করে উঠতে ওর হাত থেকে অস্ত্রটা পড়ে গেল। মার্টেল নিজের দেহটা দিয়ে সজোরে ওকে ধাক্কা মারতে সোফার পেছনটায় পড়ে গেল। হারের স্কার্টটা উরুর ওপরে উঠে গেছে। সুন্দর সুডৌল পা-জোড়া দেখা যাচ্ছিল। যৌন উত্তেজনায় অস্থির মার্টেল হফারকে ধরে শোওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

–বেজন্মা কুত্তা কোথাকার। বলেই সজোরে একটা ঘুষি মারল। একেবারে স্থির হয়ে গেল। মার্টেল ওর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ঠিক তখন হফার চেতনা ফিরে পেয়ে শক্ত দুটো আঙুল ওর চোখে ঢুকিয়ে দিতে চাইল। ক্রোধে মার্টেল ওর গালে সজোরে এক থাপ্পড় কষালোলা।

আমি তোমার ঘাড় একেবারে ভেঙ্গে দেব...।

এবার মার্টেল লক্ষ্য করল ওর চোখে ভয়ের কালো ছায়া। ওকে ওল্টাতে গেলে কোনরকম বাধা দিল না। মার্টেল নিজের বেল্ট খুলে ওর হাতের সঙ্গে পা দুটো বাঁধলো।

হফার যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

মার্টেল ভাবল এবার ওর চলে যাওয়া উচিত। ও হারের মুখে রুমালটা ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে সোফায় বসিয়ে দিল।

দ্রুত বেডরুমের দিকে এল। ওখান থেকেই সেই শব্দটা ভেসে আসছিল। ওয়ারড্রোব কাপবোর্ডের দরজা দুটো খুলে ফেলে ভালভাবে দেখতে লাগল।

কালো চুলওয়ালা মেয়েটা মেঝেতে পড়ে ছটফট করছিল। মুখে স্টিকিং প্লাসটার আটকানো।

হ্যালো, ক্লেয়ার হফার। ও বলে উঠলো। মৃদু হাসল। আবার বলল, সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। এখন নিশ্চয়ই স্বস্তিবোধ করছে।

***

বুধবার, সাতাশে মে :

হফার প্রথম ধাক্কাটা কিছুটা সামলে নিয়েছে। ওর জিনিষটা কাপবোর্ডের ভেতর দেখে নিল। রান্নাঘরটা পরিষ্কার করলো।

–তুমি কেমন করে জানলে মেয়েটা এরকম করছে? ও জিগ্যেস করলো।

ওদের বন্দীতখন মেঝেতে আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। মার্টেল ওর বেল্টটা খুলে ওকে একটা দড়ি দিয়ে বাঁধলো। আগেকার প্লাস্টারটা খুলে নতুন একটা লাগিয়ে দিল।

মার্টেল বলে উঠলো, যদিও ওর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সবকিছু মিলে গিয়েছিল তবুও একটা ব্যাপার যে ওর চোখে কালো চশমা ছিল। এখন আমরা জানি কেন–ওর চোখ দুটো বাদামী।

নিশ্চয়ই, অনেক...

যখন আমি শোবার ঘরে ঢুকি তখন তোমার কসমেটিকস ড্রেসিং টেবিল একেবারে গোছানো অবস্থায় ছিল। একটা ব্যাপারে, কাঁচের সঙ্গে স্টিকিং প্লাস্টার এটাই আমার কৌতূহল জাগিয়েছে। ওর এমন কোন কাটা ছিল না, যা দেখা যায়।

–কিন্তু অন্য ব্যাপারও ছিল...।

–যেমন...?

সবচেয়ে বাজে ব্যাপার যেটা তাহলে ও একেবারেই জানত না কাপবোর্ডটায় কফির কাপ থাকে। ও ওয়ার্নারের আসার ব্যাপারটা বেমালুম অস্বীকার করল। ওয়ার্নার ওর মতো আকর্ষণীয়া মহিলাকে একবার চেষ্টা করবেই। সুতরাং ও চার্লিকে ডাকল। সব সময়ই চার্লসকে ও উৎসাহ দিত।

–তুমি দারুণভাবে লক্ষ্য করেছে। এখানে কফি আছে?

–না বসার ঘরে।

একটু থেমে আবার বলল, আমাদের প্রতারককে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে। কাপবোর্ডের মধ্যে তোমার শব্দের ব্যাপারটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তুমি ওখানে একটা সুযোগ নিয়েছিলে–

আমি একটা মানুষের শব্দ শুনে বুঝেছিলাম তুমি এসে পড়েছ। ও আমাকে বোকা ভেবেছিল। ও কি তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল?

এরপরে ওরা বসার ঘরে ফিরে গেল। ওখানে ওদের সঙ্গী ফায়ার প্লেসের সামনে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। যার ফলে মার্টেলের কণ্ঠস্বর ও শুনতে পায়নি। ও কি তোমাকে খুন করতে গেছিল? কথাটা বলে উঁচওয়ালা অস্ত্রটা হাতে নিল।

মনে হয় তাই। আমি যখন ওকে চেপে ধরলাম ও তখন আপ্রাণ চেষ্টা করছিল ওটা আমার ঘাড়ের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিতে। একটা বোতাম টিপলেই ওর ভেতর থেকে ফ্লুইড বেরিয়ে আসবে। ঔষধের প্রতিক্রিয়া ওর ওপর দিয়েই দেখা যাক।

ও ভাল করে জিনিষটা ধরল। তারপরে মেয়েটার দিকে ঝুঁকে পড়ে মুখের প্লাস্টারটা মুখ থেকে ছিঁড়ে দিল। মেয়েটা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল। ওর ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল

রেখে মার্টেল বলল–একটা কথা নয়। আমি যা যা প্রশ্ন করবো ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। তোমার আসল নাম কি?

মুখের মত প্রশ্ন কোরনা...।

–যদি এটা তোমার ঘাড়ে ঢুকিয়ে বোতামটা টিপে দিই কি ঘটবে নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার...।

মার্টেল কথাটা বলে অস্ত্রটা হফারের ঘাড়ের দিকে এগোতে লাগল।

ওর বাদামী চোখ করুণ অসহায় হয়ে উঠলো–ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে মেরো না।

মার্টেল ব্যঙ্গ করে বলে উঠলোতোমাকে আমি বাঁচাবো, তুমি আমায় এটাই করতে চেয়েছিলে। ভাল চাও তো বলে ফেল...।

–গিসেলা জোবেল।

-তোমার ঘাঁটিটা কোথায়?

বাভেরিয়া, মিউনিক! দোহাই... পিটির দিব্যি...!

–পিটি?

মার্টেল হারের মুখের দিকে একভাবে চেয়ে রইল। হফারের দৃষ্টিও ওর দিকে।

–কেন না কথাটার মানেও বোঝে না? এই ভাবেও আমাকে পরীক্ষা করেনি।হার অনেকটা মরিয়া হয়ে বলে উঠলো।

খানিকটা শ্বাস ফেলে আবার বললো, তুমি ঠিক করে ফেলেছ...।

ও একটা সিগারেট ধরিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। মার্টেল সঁচটাকে আরো কাছে এনে একভাবে প্রশ্ন করল, কার জন্যে তুমি কাজ করছে বলতো?

-ও আমাকে মেরে ফেলবে...।

–তুমি যদি ঠিকমতো জবাবনা দাও এই যন্ত্রটা ঠিক তুমি যেভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলে, আমিও সেইভাবে ব্যবহার করে দেখব। আমরা খবর পেয়েছি যে ওয়ার্নারকে গোপন রুটে পাঠানো হয়েছিল। বলল শিগগির...।

রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ।

বলার পরেই আতঙ্কে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মার্টেল তখন ধীরে ধীরে সূঁচটা হফারের কাঁধ থেকে সরিয়ে নিল।

–আমাকে একটা ছিপি দাও যাতে এই বিচ্ছিরি জিনিষটা ঢাকা দেওয়া যায়।

ওর কথায় হফার রান্নাঘরের দিকে এগোতে থাকলো মার্টেল ভাবতে লাগল, এই অস্ত্রটা দিয়ে গিসেলা জোবেল ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

এখন ওর একটা কাউন্টার এসপিয়নেজ কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া উচিত। ফরেনসিক এটা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখবে।

***

মেয়েটা ওর দিকে তাকিনেন তাপারটা জানা। সামান্য মামার দিকে তাকিয়ে বলল।

রাত দশটা বেজে যেতে মার্টেল ঠিক করলো যে এবারে ওরা নিরাপদেই এই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোতে পারবে। হফার একটা ব্যাগ প্যাক করল। ইতিমধ্যে মার্টেল পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাউর-আ-ল্যাকে' সাদা পোষাকের গোয়েন্দা পাঠাতে বলল। বিলটা জমা দিয়ে ও স্ক্যাটকেলটা নিয়ে নেবে। ব্যাগটা হলঘরে রয়েছে।

–আমরা সেন্ট স্যলন থেকে ট্রেন নেবো। মার্টেল সুইস মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল।

–আমাদের কাজ ওয়ার্নারের ব্যাপারটা জানা। সামান্য মাত্রই এগোন গেছে। মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, একমাত্র ওখানেই ও থামতো। এটাই ওর এখান থেকে ব্যাভিরিয়ার যাবার পথে কাজ...।

যাক, তাহলে আমরা যতটুকু পেয়েছি, সেই ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ করা যাক।

সন্ধ্যেবেলাটা নানা কাজে ভর্তি থাকে। হফারও পকেট থেকে ডায়েরী বার করে মার্টেলকে ফোন করলো।যখন ও ওর বস ফার্ডি আর্নল্ড–এর সঙ্গে কথা বলছিল, তখন ও আয়নায় একভাবে দেখে যাচ্ছিল।

টুইডের বর্ণনানুযায়ী একেবারে এক।

মেয়েটা দেখতে সুন্দরী। লম্বা কালো চুল। নরম কণ্ঠস্বর আর ছন্দময় চলাফেরা, ইতিমধ্যেই মার্টেলের ওকে পছন্দ হয়েছে। কিন্তু ও এমন একজনকে খুঁজছিল যে আরও গতিশীল।

সুইস কাউন্টার এসপিয়েনজ-এর প্রধান জুরিখ থেকে নিজের এরোপ্লেনে এসেছে। ছোট-খাটো গম্ভীর মুখের মানুষ ফার্ডি আর্নল্ড। ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়।

–আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্সে ওকে নিয়ে যাব বলে গিসেলা জোবেলকে দেখল। ও ততক্ষণে আরামদায়ক চেয়ারে বসে পড়েছে।

–ওকে একটা স্পেশাল হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ওকে ভাল নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। ওকে সবকিছু জিজ্ঞেস করা যাবে। ও মার্টেলের দিকে তাকালো।

–আজ ঠিক দশটায় এই নাম্বারে আমাকে ফোন কোর। ছোট্ট প্যাডে ফোন নাম্বারটা লিখে ইংলিশম্যানের হাতে দিলো। খানিকক্ষণ তাকালো।

আমার কাছে জুরিখ কোডও আছে। যদি তুমি কাগজটা হারিয়ে ফেল।

আর্নল্ড মার্টেলের কথা শুনে মৃদু হাসল, বললো–আমি যে তোমাকে বিশ্বাস করিনা, তা তো। নয়।

কিন্তু একজন ইংরেজ এজেন্ট, ওয়ার্নার চিহ্নিত হয়ে গেছে। এমন কি জার্মানের মত আচরণ করেও–সুতরাং তুমি সমস্ত দিকগুলো দেখছ। আজ সকাল দশটায় তোমায় কেন ফোন করেছিলাম? নিশ্চিত তুমি কেবলমাত্র জোবেলের প্রাত্যহিক জিজ্ঞাসার ব্যাপারটা আরম্ভ করেছ। বিপরীত ভাবে বলতে হয় আমরা কেবলমাত্র শেষ করেছি। যেহেতু এ মহিলাকে সারারাত জিজ্ঞাসা করার আছে।

মার্টেলকে খুশী মনে হলনা। সত্যি ব্যাপারটা ধরা যাচ্ছেনা। ফার্ডি আর্নল্ড আরও দক্ষ চালক হফার এর সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা আছে। ওর তীক্ষ্ণ অনুমান শক্তি দিয়ে এটা বুঝছে।

–এসো, শোবার ঘরে এসো। গিসেলার দিকে তাকিয়ে বলল।

এরপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ওখানে আমি কথাগুলো জোবালকেই শোনাতে চেয়েছিলাম। ওরা যদি ওদের ভাগ্যে কি আছে জেনে উদ্বিগ্ন হয় তাহলে আমাদের পরিকল্পনাটা সফল হতে পারে।

মার্টেল বলল, ও স্বীকার করেছে যে ও রেইনহার্ড দিয়াত্রিচের হয়ে কাজ করেছে।

–আচ্ছা।

আর্নল্ড-এর ঐ বিবৃতির ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখা গেল না। মার্টেলের মনে পড়লো লন্ডনে ওকে টুইড বলেছিল সুইসরা নিরপেক্ষতার নীতি নিয়ে চলছে। সুইস পাল্টা

গোয়েন্দারা জার্মান নয়া-নাজী মুভমেন্টের ব্যাপারে খোলাখুলি সংঘর্ষ চায়না। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এটাকে সাহায্য করা মোটেই যায়না। মার্টেলের অনুমান, আর্নল্ড সতর্ক নজর রেখেছে।

বার্নে, গুজবের ব্যাপারে খুবই বিরক্ত। উত্তর সুইজারল্যান্ডে একটা গোপন সংগঠন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে।

–সেন্ট গ্যালন?

–তুমি কি করে ঐ জায়গার কথা জানলে?

মার্টেল স্বাভাবিক উত্তর দিলো, কারণ ঐ জায়গাটা উত্তর-পূর্ব সুইজারল্যান্ডের একটা অন্যতম বড় শহর। আমার কাছে ডেলটা শব্দটা খুব আকর্ষণীয়। রাইন ডেলটা, অষ্ট্রিয়ার কাছে তোমাদের যে সীমানা, ঠিক সেখানেই রয়েছে।

মার্টেল কথা বলতে বলতে আর্নল্ডের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। ওয়ার্নারের নোটবুকে আরো একটা অস্টিয়ান বন্দরের নাম আছে ব্রে গেঞ্জ।

–আমরা অস্টিয়ান পাল্টা গোয়েন্দার সংস্পর্শে এসেছি, আর্নল্ড বলল। বার্নে, এখানকার এই জুরিখের হালফিল অবাঞ্ছিত ছাত্র সংঘর্ষের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর। মনে হয় ওরা গোপন ডেলটা চক্রের মাধ্যমেই সংগটিত।

ও রিস্টওয়াচটা দেখে বলল, আমাকে এখন যেতে হবে।

ও এত দ্রুত বেরিয়ে গেল মেয়েটার দিকে তাকিয়েও দেখল না। মার্টেল শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল গিসেলা জোবেল নেই। কোন কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই হফার ওকে বুঝিয়ে দিল।

–অ্যাম্বুলেন্সের একটা টীম এসে ওকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেছে।

–আর্নল্ড খুব একটা সময় নষ্ট করেনি। ও যাবার সময় তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছে? তুমি কি বলেছে যে আমরা সেন্ট গ্যালেন' যাচ্ছি।

ও অবাক হয়ে বলে উঠলো, না, কেন কোন গণ্ডগোল হয়েছে কি? আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মার্টেল ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে থাকা ব্যাগদুটো তুলে নিল।

–তুমি তো আমাকে জানো, আমি অনেক প্রশ্ন করি। আমাদের এখন হাউন্টব্যানহফ'-এর ট্রাম ধরতে হবে।

–তাড়াতাড়ি করতে হবে। ট্রাম সোজা স্টেশনের দিকে যায়। নাম্বার আট। এটাই সবথেকে ভাল পথ।

ওয়ার্নারও তাই ভেবেছিল।

***

নির্মম অত্যাচার, উন্মত্ত বলে ওরা অ্যাপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে দিলো। রাত দশটা। ব্যানহফ ট্রামের খিলানটা ওদের চোখে পড়েছে। কিছু লোকের আনাগোনা। শান্ত পরিবেশ।

মার্টেলের সেন্ট্রাল হকের অ্যাপার্টমেন্টে আসার পর নতুন একটা জিনিস সংযোজন হয়েছে। তা হলো কোল্ট ৪৫। ওর কাঁধে স্প্রিং-এর হোলস্টার। যেখানে ঐ মহিলাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেই ওয়ারড্রোবের গোপন জায়গায় এটা ছিল। হফারই দিয়েছে।

মার্টেলের এই রিভালভার থাকাটা বে-আইনি। যাবার পথে সীমান্ত এলাকা পড়বে না, সুতরাং অসুবিধা খুব বেশী নেই।

ও ওকে জিজ্ঞেস করল যে, ওর কাছে যেটা আছে, তা ফার্ডি আর্নল্ড জানতে পারবে না তো? ওকে না বলতে অনুরোধ করল কেন নিজেও বুঝতে পারল না।

–ওখানে টিকিট মেশিন আছে। হফার দুটো কেস নিয়ে ওকে অনুসরণ করলো। আমি যখন ট্রামে উঠব আমার কেসটা আমিই নেব।

ও দেখলো মেয়েটা কয়েকটা পয়সা ঢোকালো। ল্যাম্পের আলোয় মেয়েটাকে সুন্দরী দেখাচ্ছে। মার্টেল বুঝতে পারল না মেয়েটা কেন কাজ করছে। ওকে আরো ভাল করে না জানলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না।

লেকের দিক থেকে ট্রাম আসছে। ট্রামের আওয়াজ ক্রমেই বাড়তে লাগল। ক্রমশ মার্সিডিসটা সামনে এসে ট্যাঙ্কের মতো সজোরে আঘাত করল। টিকিট মেশিনের কাছে যেখানে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল সেখানে এসে আঘাত করে থামলো।

আঘাতটা মার্টেলের কাছে একটা খুঁটির মত। ও দেখল, মার্সিডিস থেকে বেরিয়ে এসে দুজন লোক হফারকে চেপে ধরেছে। আর একজন ওর মুখের ওপরের অংশটায় কাপড় ঢাকা দিচ্ছে। রাস্তার আলোয় ওদের ডিনোমিনেটার দেখা যাচ্ছে। ত্রিভুজাকৃতি ব্যাজ লাগানো। অনেকটা গ্রীক অক্ষর ডেলটার মত।

***

ও এবার ট্রামের ঘণ্টা শুনতে পেল। মার্সিডিসটা আড়াআড়িভাবে লাইনটা ব্লক করে দিয়েছে। এবারে একটা রোলস রয়েস এলো। আগের ড্রাইভার ক্রমাগত বেল বাজাতে লাগল।

মার্টেল ব্যাগগুলো ফেলে হাতে কোল্ট ৪৫ নিয়ে এগোতে লাগল। রোলসটা সামান্য বেঁকে গেল। তারপর হেডলাইটের আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এক হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে আর এক হাতে ট্রিগার টিপল, পরপর দুবার। হেডলাইট নিভে গেল। কেউ একজন হঠাৎ মার্টেলকে লক্ষ্য করে গুলি করতে গেল।

ইংরেজটা শ্যুট করতেই সে মার্সিডিজে এলিয়ে পড়ল, কপালে রক্তের ধারা।

মার্টেল দু'জন লোকের দিকে ছুটে গেল। সঙ্গে হফার। ওর মুখের কাপড়টা সরালো। ক্লোরোফর্মের গন্ধ মার্টেলের নাকে এলো। একটা লোক মার্টেলকে সজোরে লাথি কষালো। আরো কিছু লোক এবারে বেরিয়ে এসে জড়ো হল।

জুরিখের রাস্তায় হানাহানি মার্টেলের দুঃস্বপ্ন মনে হল। আক্রমণকারীদের একজন মার্টেলকে লক্ষ্য করে পিস্তল তুলেছে। অন্য একজন মেয়েটাকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু মার্টেলের বুলেট দ্রুত গিয়ে বিধল ওর বুকে আর ডিগবাজী খেয়ে ছিটকে পড়ল।

রোলস থেকে আরও কয়েকজন বেরিয়ে এল। মার্টেলের কোল্ট থেকে আবার গুলি ছুটে একজনের গালে লাগল।

ওদের সম্মিলিত আক্রমণে মার্টেলকে হতবুদ্ধি দেখাচ্ছিল। গুলি আর খরচ না করার জন্যে রিভালভারটা লাঠির মত ব্যবহার করতে লাগল। হঠাৎ মাথার ওপর ভারী আঘাতে চোখে ঝাপসা দেখল। খানিক পরে চোখ মেলতে দেখল হারের মাথাটা মার্সিডিসে ঢোকানো আর পা দুটো একটা নোক মুচড়ে দেবার চেষ্টায় রত। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। আতঙ্কে হারের চোখ দুটো বিস্ফারিত।

ওদের মধ্যে একজন স্মোক বোমা ছুঁড়ছে। চারিদিক ধোঁয়ায় একাকার। ট্রামকে লক্ষ্য করে আর একটা বোমা ছুঁড়ল। ওদের মধ্যে ক'জন হফারকে মার্সিডিসে ঢুকিয়ে নিয়েছে। ওকে হফারের কাছে পৌঁছতেই হবে। একজন ওর কাছাকাছি হতেই মার্টেল গুলি করলো।

মার্সিডিসও আরও দুটো গাড়িতে মৃত আর আহতদের তোলা হচ্ছিল। ব্যানহফস ট্রাসের দিকে। দুটোই এগোতে লাগল। সামনে মার্সিডিস। বেশ খানিকটা বাঁদিকে প্যারেজপ্লেজ।

হঠাৎ একটা ট্রাম নিঃশব্দে ধোঁয়া ভেদ করে এগিয়ে এলো। মার্টেলের দেহ রক্তে ভাসছে। একজন ওর দিকে এগিয়ে গেল, সামনাসামনি আর কেউ ছিল না। ওকে একজন আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিল।

ওর মুখের সামনেই দেহটা পড়ে আছে। মার্টেল দ্রুত গিয়ে নাড়িটা দেখল।

বুঝল লোকটা আর বেঁচে নেই। ঘাসের মধ্যে নিজের রিভলভারটা রেখে দিল। লোকটার দিকে ঝুঁকে আর বুকের কাছে কোটে রূপোর ব্যাজ আটকানো! মার্টেল ওটা খুলে পকেটে রাখলো।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছুই পাওয়া গেলনা, ব্যাজ ছাড়া পরিচয়ের আর কোন চিহ্নই নেই। মার্টেলকে বেশ হতাশ দেখাল।

ধোঁয়ায় ঢাকা ট্রামের ছায়াটা স্পষ্ট, ড্রাইভার নেই। ও ক্যাবের মধ্যে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা দুটো কেসের দিকে তাকালো।

যে কোন সময়ে ক্যাব থেকে ড্রাইভার অদৃশ্য হতেই পারে। মার্টেল ওর জুতোটা নাড়াচাড়া করতে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর স্যুটকেশ দুটো নিয়ে আতঙ্কের জায়গাটা ছেড়ে চলল। কোথাও থেকে পেট্রোল কারের সাইরেন ভেসে আসছিল।

হঠাৎ বিস্ফোরণে মার্টেল খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। কোন উপায় না দেখে পুরনো শহরটার দিকে এগোতে লাগল। ভেবেছিল ট্রামে যাবে কিন্তু একজনকে দুটো স্যুটকেশ নিয়ে চলতে দেখলে সন্দেহ করারই কথা।

এই মুহূর্তে মার্টেলের তিনটে কাজ। এক, স্টেশনের লাগেজ লকারে সুটকেস দুটো লুকিয়ে রাখা। দুই, স্টেশনের কাছাকাছি একটা হোটেলের ব্যবস্থা করা। তিন, বার্নেতে আর্নল্ডের হেড কোয়ার্টারে ফোন করা।

***

মার্টেল অনুভব করলো যে, ও একটা ঝড়ের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কোনও ভুল টুল হচ্ছে নাতো?

আর্নল্ডের দেওয়া নাম্বার ঘোরাতেই একজন মহিলার কণ্ঠস্বর জিজ্ঞাসা করল–

-তুমি কে বলছো? এখন রাত কটা বাজে জানো?

আমি দুঃখিত। আমি চাইছি...।বলে ও নাম্বারটা একের বেশীবার বলে গেল। আর্নল্ড নামটা বলল।

–এখানে ঐ নামের কেউ থাকে না, সম্ভবতঃ তোমার রং নাম্বার হয়েছে। শুভরাত্রি।

সচওয়েইজারহফ-এর ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে ওর ভাড়া করা শোবার ঘরে মার্টেল বসেছিল। কিন্তু ওর মনটা ছিল হাউপ্টব্যানহফের দিকে। হারের লকারের চাবিটা ওর পকেটেই আছে।

ফার্দি আর্নল্ড একটা বাজে নাম্বার কেন দিয়েছিল কে জানে। তাহলে ও প্রকৃত ফার্দি আর্নল্ড নয়। আসল ফাদির সঙ্গে ওর এখনও দেখা হয়নি।

ঐ একই লোক যদি নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে থাকে তাহলে হফার নিশ্চয়ই অ্যাপার্টমেন্ট তাড়াতাড়ি ছাড়ার ব্যাপারে ওর কারণ ব্যাখ্যা করেছিল। ও জানতো বাইরে ওদের জন্যে কি অপেক্ষা করছে। কিন্তু মার্টেল যখন হফারের সঙ্গে এসেছিল তখন হফারই বা কেন ওকে আর্নল্ড হিসাবে মেনে নিলো। অনুভূতি দিয়ে বুঝল-এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কোথায়?

***

মার্টেল ঘর ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। রাস্তাটা পেরিয়ে সারি সারি টেলিফোনবুথ। একটায় ঢুকে টুইডের দেওয়া নাম্বারে আর্নল্ডকে ফোন করল। টুইডের দেওয়া নাম্বারটা আলাদা।

–কে? কণ্ঠস্বর ধারালো ও তীক্ষ্ণ।

–কোথা থেকে তুমি ফোন করছো?

–এই মুহূর্তে সেটা প্রয়োজনীয় নয়।আমি দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানাচ্ছি যে, হফার, তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লেয়ার হফারকে ডেলটা'র অপহরণ করে নিয়ে গেছে..।

–জুরিখের ব্যানহফপ্ট-এর হত্যা লীলায় তোমার অংশ ছিল?

–হত্যালীলা? মার্টেল বলল।

–ডেলটা, যদি ডেলটা হয়ে থাকে। একটা ব্যাংক রেড় হয়েছে। ব্যাঙ্কের মূল দরজায় ছোট মাইন বসানো ছিল। ওটার বিস্ফোরণে ট্রামের কিছু লোক আহত হয়েছিল। ট্রামটা ওখানেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এখনও জানতে চাই কোথা থেকে তুমি ফোন করছ?

বাদ দাও। তোমার সুইচবোর্ডের মধ্যে দিয়ে এই কল করছি।

–উন্মাদের মতো কথা বোলনা। ফার্দির কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। আবার বলল ফাদি, আমাদের নিরাপত্তা...। ব্যাঙ্ক রেইডের ব্যাপারে তুমি কিছু বলো।

মার্টেলকে একটু উত্তেজিত দেখাল, বললো, এই কল মাত্র দু'মিনিটের জন্যে, সুতরাং...

আমি তো তোমাকে বললাম, একটা বোমা, বলা যায় টাইম বোমা, ব্যাঙ্কের দরজায় ফিট করা ছিল। ব্যাপার কি ঘটল তা কেউ বোঝেনি। ওটা ছিল স্মোক বোমা আর সেজন্য ট্রামের ড্রাইভার কিছু দেখতে পায়নি।

-রোলস রয়েসের ব্যাপারে কিছু বলল যেটা তুমি জানো।

–আমি ও ব্যাপারে কিছু জানিনা। রাস্তায় আমি রূপোর, অনেকটা ডেলটা আকারের একটা ব্যাজ দেখেছিলাম।

–ক্লেয়ার হারের সতর্কতা সূচক একটা বুলেটিন পাঠাও যাতে সমস্ত পয়েন্ট থাকে।

মার্টেল কলের দৈর্ঘ্যটা দেখে নিল।

–ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়...।

–দুঃখ এখন থামাতে পারো। ওর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা মার্টেলের পছন্দ হলনা।

আমরা জানি, ওর কি হয়েছে, এটাও গল্পের একটা অংশ।

–এখন খ্রীষ্টের দিব্যি, আমায় বলল এবং তাড়াতাড়ি...মেয়েটা...।

লিম্মাট'-এ ওর দেহটা ভাসছিল। সেরকম অবস্থাতেই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। আধঘণ্টা আগের ব্যাপার। মেয়েটাকে নৃশংস ভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। তারপর নদীতে ফেলে দিয়েছে। আমি চাই তুমি এসো। মার্টেল তুমি বার্নের ঠিকনাতে এসো...।

আর্নল্ডের কথা থামতেই, মার্টেল ফোনটা ছাড়লো।

***

২. কলের উৎস

বুধবার, সাতাশে মে :

আর্নল্ড যদি কথাবার্তা চালিয়ে যেত তাহলে ওর কলের উৎসটা জেনে যেতো। এ ব্যাপারে মার্টেল নিশ্চিত। প্রকৃত আনন্ডের চেয়ে নকল আর্নল্ডের কাজকর্মই বেশী ভাল।

বুথ ছেড়ে মার্টেল হাউপ্টব্যানহফের দিকে এগোলো। খানিকটা ঘোরাফেরা করল। ডিপারচার বোর্ডটা দেখল। মিউনিকে এর অংশটায় খুন হয়ে যাওয়া ওয়ার্নারের জন্যে একটা মোহ জড়িয়ে আছে।

মার্টেল জায়গাটার একটা তালিকা করলো। গ্রেইস এক থেকে সোল। সবশুদ্ধ ষোলটা প্লাটফর্ম। রাস্তাগুলো এখানেই শেষ হয়েছে। সারি সারি ফোনবুথ। অনেকগুলো ঢাকার আর বেরোবার রাস্তা। ম্যাক বুথও আছে।

মার্টেল দ্রুত রাস্তায় নামল। হাঁটতে হাঁটতে লিমাট নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো। এই জলের মধ্যেই ক্লেয়ার হারের ক্ষত-বিক্ষত দেহ পড়েছিল। শোধ ওকে নিতেই হবে, কারণ নৃশংস ব্যাপারটা ওকে খুবই আঘাত করেছে।

চারিদিকে পুলিস কোয়ার্টার। এখানেই ওর বন্ধু ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ ইন্সপেক্টর ডেভিড নাগেল কাজ করে। ঘড়িতে দেখল পৌনে এগারোটা। শেষ ট্রেন ছাড়তে আর এক ঘণ্টাও বাকী নেই। জুরিখের এই মরণফাঁদ থেকে মুক্তি পেতেই হবে।

ও লিনডেনহফস্ট্রাসেতে গিয়ে পুলিস হেড কোয়ার্টারে ঢুকল। সামনেই রিসেপশনিস্ট জানাল নাগেল অফিসে আছে, কিন্তু দেখা করতে হলে ফর্ম পূরণ করতে হবে।

মার্টেল তা না করে গম্ভীর মুখে জানালো, ওকে গিয়ে আমার নাম বলল। তাড়াতাড়ি, আমার সময় মূল্যবান।

লোকটা আমতা আমতা করতেই মার্টেল বলল, ও আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে...।

***

কয়েক মিনিটের মধ্যে ও নাগেলের খোলামেলা অফিসঘরে ঢুকে গেল।

–আমি তো তোমাকেই আশা করেছিলাম। করমর্দন করে নাগেল বলল, টুইড আমাকে লন্ডন থেকে জানিয়েছিল তুমি আসছো, কোন সাহায্যের দরকার?

ডেভিড জাতে সুইস। সুগঠিত চেহারা, কালো গোঁফ, কালো চুল, ধূর্ত–চোখ। অবিবাহিত, বুদ্ধিমান, স্পষ্টভাষী।

-তুমি তো ফর্মটা পূরণ করেনি, তাই না? নাগেলের চোখেমুখে যেন অস্বস্তি। মার্টেল চোখ থেকে সৌখিন চশমাটা খুলল। নাগেল ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ফার্দি আর্নল্ডের সিকিউরিটির লোকেরা তোমাকে সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মার্টেল সিগারেট খেতে আরম্ভ করল। টুইড ওকে জানিয়েছিল, নাগেল আর্নল্ডকে অপছন্দ করে। নাগেল বলল, তোমার নামটা কোন ব্যাপার নয়। তুমি কোড নাম ব্যবহার

করবে আর কোন অফিসিয়াল রেকর্ড রাখবে না। আমি আমার রিসেপশানের লোকটাকে বলে দেবে, তুমি আমার বিশ্বস্ত লোক। তাহলে আর্নল্ডের লোকজনের হাত থেকে রেহাই পেতে সহজ হবে।

মার্টেল মাথা নাড়লো।নাগেল বলল, এখানে আমার ফোন নাম্বার আছে। জরুরী হলে অবশ্যই ফোন করবে।

দশ মিনিট আগে হফার আমাকে ফোন করেছিল। ও জানতে আমরা বন্ধু। ক্লেয়ারকে আমি বিশ্বাস।

মার্টেল শরীরে শিহরণ বোধ করল। ওর সামনের ঘূর্ণাবর্ত আরো দ্বিগুণ জোরে ঘুরে চলেছে।

***

বুধবার, সাতাশে মে :

সিগারেট হোল্ডারটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিল।

নাগেলের কথা ওর মনে পড়ল, দশ মিনিট আগে ও ফোন করেছিল।

আধঘণ্টা আগে আর্নল্ড ওকে ফোনে বলেছিল ক্লেয়ারের মৃতদেহ লিমাট নদীতে পাওয়া গেছে। সুতরাং এই ঘটনার এক ঘণ্টা আগে হফার বেঁচেছিল। নাগেলের লেখা সেন্ট

গ্যালেনের ফোন নম্বরের কাগজটা এখন ওর হাতে ধরা। নাগেলের কণ্ঠস্বর মার্টেল চেনে।

-কোথাও গণ্ডগোল একটা...? নাগালের নরম কণ্ঠস্বর মার্টেলের কানে গেল।

–হুঁ,বলে কাগজের টুকরোটা ও পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। জিজ্ঞেস করলো,রাতে কি করছো?

রুটিন মাফিক কাজ।

মার্টেল ভাবতে লাগল গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান ব্যক্তি। সে এখনও নিজেই জানে না ব্যানহফস্ট্রাসেতে কি ঘটেছে?

ফার্দি আর্নল্ডকে তুমি অবিশ্বাস করো কেন?

-আচ্ছা তাহলে হফার, যে আর্নল্ড-এর হয়েই কাজ করে, তোমাকে আমার কথা বলেছিল ওই তো...?

–আসলে ক্লেয়ার জানে আমরা দুজনে বন্ধু। ও পাল্টা গুপ্তচর হবার আগেই আমার কাজ করছিল।

–তুমি বললে, আজ রাতে রুটিন মাফিক কাজ আছে।

-না একটা অন্য কাজও আছে। লিমাট নদীর দিক থেকে একটা শব্দ পেয়েছিলাম, একটা লঞ্চে বিস্ফোরণে এক হতভাগা মারা গেছে। এই বলে নাগেল জানলার ধারে তাকালো।

মার্টেল নাগেলের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালো। নাঃ ও কোনরকম মিথ্যে কথা বলছে না বলেই মার্টেলের মনে হল।

আবার দেখা হবে? চলি। কিন্তু আমি তোমাকে কিছু বলতে চাইছি, তুমি শুনছো না। নাগেল ওকে তিনটে ফোন দেখিয়ে বলল, এর মধ্যে তোমাকে একটা ছেড়ে দিতে পারি..ঐখানে সুইচবোর্ডে সরাসরি লাইন আছে।

না ডেভিড, তার দরকার নেই। আমার সময় কম।

যাইহোক মার্টেল, জরিখ সফর তোমার সখের হোক এই কামনা করি।

***

– ঠিক এগারোটায় মার্টেল পুলিস হেড কোয়ার্টার ছাড়ল। সেন্ট গ্যালেনের ট্রেনের আর আধ ঘণ্টা সময় আছে, ওকে ধরতে হবে। বাইরে এল। দুটো পেট্রল কার পার্ক করা আছে। দুজন ইউনিফর্মধারী বসে আছে। বহফসট্রাসের সেই শয়তানটা এখন কোথায়?

হাউপ্টব্যানহফ-এ যেতে হবে বলে ও মিথ্যে বলেছে। মার্টেল ভাবল এই সুইসটাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু ফোনের ব্যাপারটাতে নয়।

স্টেশনের সামনেই অনেকগুলো ফাঁকা বুথ। একটায় ঢুকলো ও। নাগেলের দেওয়া নম্বরে ডায়াল করলো ও।

সেন্ট গ্যালেনের হোটেলের রিসেপশনিস্ট বলল, ক্লেয়ার হফার ওদের সঙ্গে ছিল। মেয়েটি ওকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল।

খানিক পরে একটা ফোন এলো, ওপারে মহিলা কণ্ঠস্বর। মার্টেল জিজ্ঞেস করলো, কে বলছো?

জবাব এলো, আমাদের বন্ধু নাগেল, তোমার কথা আমাকে জানিয়েছে। আমি চাই দ্রুত ব্যবস্থা নাও। বাইরে যদি কোন ফোন পাও তাহলে এই নাম্বারে ফোন করো।

বলে ও বুথের নাম্বারটা বলে গেল। আবোও বলল, এটা জুরিখের ফোন নাম্বার। যাইহোক আমার হাতে সময় কম। গুডবাই...।

মার্টেল ঘামতে ঘামতে অনুভব করলো যে ও ক্রমশঃ ফাঁদে পড়ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে শুনল, সেই একই কণ্ঠস্বর।

আমাদের বন্ধুর নামটা...

ডেভিড নাগেল...।

–ক্লেয়ার হফার কথা বলছি...।

–আমি যা বলেছি তুমি তাড়াতাড়ি করো। হোটেলে একটা যুক্তি খাড়া করে বিলটা মিটিয়ে দাও।

–শোন, সেন্ট গ্যালোনে আর একটা হোটেল নিয়ে আমার জন্যে একটা ঘর রিজার্ভ করো। ওদের বলল আমি ঠিক ভোর একটায় পৌঁছবো। ট্রেনে যাবো।

মার্টেল ফোনটা ছেড়ে দিয়ে ভাবল সময় অতি মূল্যবান। মেয়েটাকে ভালই লাগল। ওর মনে হল যেন ও কোন মৃতের সঙ্গে কথা বলেছে। আবর্তটা ওর চোখের সামনে আরো সজোরে ঘুরতে লাগল।

মার্টেল সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁটে রাখল। ওর মনের মধ্যে কেমন যেন অস্থিরতা। চারিদিকে তাকালো ফাঁকা জায়গা। কয়েন বক্সটা একবার দেখল। ও একটা ড্রাগ মুখে দিলো। আবার ফোন করলো। আবার সেই মেয়েলী কণ্ঠস্বর।

আমাদের বন্ধু...।

নাগেল, আমি মার্টেল...।

বাঃ, কপালটা ভালই। দোতলার ঘরে দুটো বিছানা। হোটেল মেট্রোপল। স্টেশনের বাইরের দিকে মুখ। তুমি চলে এসো। আমার ঘরের নাম্বারটা খামের মধ্যে রেখে আসবো। কেমন? ভালই হবে। গুড বাই।

পরের কয়েক মিনিট মার্টেল দ্রুত কাজ সারলো। হোটেলে ও ঘর ভাড়া নিয়েছে যদিও বেশীক্ষণের জন্যে নয়। বাতিল করতেই হত।

হোটেলের রেজিস্ট্রেশান ফর্মে লিখল, আমি কনসালট্যান্ট মেডিক্যাল। আমার একটা রোগীর বাড়িতে যেতে হবে। লিখে সই করল।

***

ওর ব্যাগটা ভোলাই আছে। যখন কোথাও যায় তখন এই ভাবেই ও সাবধান হয়। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে এলো। স্টেশনের বাইরের প্রথম ট্যাক্সিতে চেপে ড্রাইভারকে প্যারোডিপ্লেসে' নিয়ে যেতে বলল। ওখানে আমি একজনকে একটা জিনিষ দিয়ে আবার তোমার গাড়িতেই আবার এখানে আসবো। তুমি ট্রাম স্টপেজে অপেক্ষা করবে।

ড্রাইভার সম্মত হলো। গাড়ি এগোল। রাস্তা-ঘাট ফঁকা।

সেন্ট গ্যালেনের ট্রেন ছাড়বার কয়েক মিনিট বাকি। ওর বিশ্বাস ম্যানেজ করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। বিস্ফোরণের জায়গাটাও দেখেছে।

মার্টেল ড্রাইভারকে বললো, কিছুক্ষণ আগে এখানে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল, শুনেছিলে।

–হুঁ, শুনেছি। তবে গুজব নৌকোয় একজন ট্যুরিস্ট মারা গেছে।

মার্টেল বুঝলো ব্যাপারটায় এখন সবাই সতর্ক হয়ে গেছে। ওরা এতক্ষণে প্যারোডিপ্লেসে' চলে এসেছে। ড্রাইভার বললো, একটু আগে পুলিশের মুখে শোনা...।

–পুলিশ? ভুরু কুঁচকে মার্টেল বলল।

–হুঁ, হাউপ্টব্যানহফে একটা পেট্রোল কার থেমেছিল। ওর ড্রাইভারটা এসে ট্যুরিস্টের ব্যাপারটা বলেছিল।

–চেনো নাকি?

আমি এই শহরে কুড়ি বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছি, শহরের প্রতিটা পুলিশকে আমি চিনি। কিন্তু একে আমি আগে কখনও দেখিনি।

সম্ভবতঃ নতুন...।

না, বয়েস অনেক। যাইহোক আমি এখানেই দাঁড়াই?

প্যারোডিপ্লেসের মধ্যেই গাড়িটা পার্ক করা হলো। মার্টেল এগোল।

রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। নিজের জুতোর শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে থমকে দাঁড়ালো। সেই আবর্ত ওর চোখের সামনে আবার পাক খেতে লাগল।

দু-ঘন্টা আগের সেই রক্তাক্ত ঘটনার চিহ্নমাত্র নেই। সঠিক জায়গায় যে সে এসেছে, সেই খিলানটা দেখে চিনলো। এখানেই ও আর মেয়েটা এসেছিল। ডানদিকে বড় ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের দরজায় ডাবল প্লেটের কাঁচ লাগানো।

রাস্তার ধারে কোথাও কাঁচের চিহ্ন নেই। সুইসরা রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতে নিপুণ। কিন্তু এখানে কেমন যেন বিবেচনার অভাব।

রাস্তায় এখন রক্তের কোন চিহ্নই নেই। ওর জুতোয় এখনও সেই শুকিয়ে যাওয়া রক্ত লেগে আছে। বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া গাছটার বদলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে নতুন একটা গাছবসান হয়েছে। সুইসরা এমনই নিখুঁত।

***

বৃহস্পতিবার, আঠাশে মেঃ

ব্যাভেরিয়ার অ্যালগাও'তে একেবারে ভেতরের দিকের একটা জায়গা। নিজের লাইব্রেরীর ঘরের জানালার সামনে রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ দাঁড়িয়েছিল। মাঝ রাত অতিক্রম করে গেছে বৈদ্যুতিক সংকেত যন্ত্রটা একটানা বাজতে আরম্ভ করল।

ও এসে একটা ড্রয়ারের চাবি খুলল।

রিসিভারটা তুলল।

এরউইন ভিনজ নিজের পরিচয় দিতেই দিয়েত্রিচের কণ্ঠস্বর সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

গম্ভীরভাবে বলল, খবর আছে?

–ইংরেজটা জুরিখ ছেড়ে গেছে।হাউপ্টব্যানহফ থেকে এগারোটা উনচল্লিশের ট্রেন ধরেছে। আমাদের লোকেরা পৌঁছবার আগেই ও কম্পার্টমেন্টে ঢুকে গেল।

জুরিখ ছেড়ে গেল! কি বলছো? সেন্ট্রাল হক অ্যাপার্টমেন্টে কি হল?– অপারেশন সম্পূর্ণ সফল হয় নি।ভি নার্ভাস গলায় বলে উঠল। দিয়েত্রিচের মুখটা কঠিন হয়ে গেল। কোথায় কি হয়েছে সঠিক ভাবে আমায় বল।

–মেয়েটা একেবারে ছুটি নিয়েছে। সুতরাং ওর কাজের ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। আমাদের যেটা লাভ হল, ও কোনরকম খবর দিতে পারবে না। ওর ব্যাপারে তোমার ভয়ের কিছু নেই।

–কিন্তু মার্টেলের বিষয়ে ভয়ের আছে বইকি! ও কোথায়? কোন্ ট্রেনে গেছে?

–ওর গন্তব্যস্থল সেন্ট গ্যালেন।

–দিয়েত্রিচ রিসিভারটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে ভিনজকে কিছু নির্দেশ দিয়ে ফোনটা ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

ব্রান্ডির গ্লাসে চুমুক দিয়েই গ্লাস শেষ করে বেলটা বাজাল।

একজন কুঁজো লোক ঘরে ঢুকল। মাথার দু’পাশের কানদুটো একেবারে চ্যাপটা। পরনে সবুজ পোষাক। প্রভুর গ্লাসটা হাতে নিল ও।

–অস্কার আরও ব্রান্ডি নিয়ে এসো। ভিনজ আর ওর দলের লোকেরা কাজটা নষ্ট করেছে। মার্টেল এতক্ষণে সেন্ট গ্যালেনে। আমরা তো ইংরেজটার সঙ্গে অস্কার বলল।

দিয়েত্রিচের বয়স ষাটের মত।নাকের নীচে মোটা গোঁফ, রূপোলী চুল, লম্বা সুগঠিত চেহারা। পোষাক-পরিচ্ছদে স্মার্ট লাগছিল।

ও প্রথমে ইলেকট্রনিক্সের লাইনে ঢুকেছিল। হেডকোয়ার্টার স্টাটগাটের। অ্যারিজোনাতেও ওর বিরাট ফ্যাক্টরী আছে। অস্কারের দিকে চেয়ে বলল, আমাদের লোকেদের সঙ্গে ভিনজ সেন্ট গ্যালেনে যাচ্ছে। রাতের বেলা মার্টেলকে ধরা যাবে। কিন্তু রাতের বেলা মার্টেল কোথায় যাবে? সুইস রমনী ক্লেয়ারকে তো বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। অপারেশন ক্রোকোডাইলকে কোনকিছুই ব্যাঘাত করবে না। তেসরা জুন সামিট এক্সপ্রেস জার্মানী অতিক্রম করবে। চৌঠা, ব্যাভেরিয়ায় নির্বাচন। ডেল্টা ক্ষমতায়

–কিন্তু মার্টেল।

–নির্দেশ আছে–হত্যা।

***

সেন্ট গ্যালেনের রাতের ট্রেনে মার্টেল চেপে বসল। ও নিশ্চিত যে কেউ ওকে অনুসরণ করছে না। জানলা দিয়ে তাকালো একবার। কোন যাত্রী এখনও ওঠেনি। প্রথম শ্রেণীর কামরা। ও ধারের একটা সীটে গিয়ে বসল।

সেন্ট গ্যালেনে ট্রেন থেকে নামার কথা। দ্রুত স্যুটকেসটা নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বেরোবার দিকে এগোলো। হারের কথানুযায়ী স্টেশনের সামনের হোটেলে গিয়ে ঘরের ভাড়া জিজ্ঞেস করল। দু'রাতের জন্য ঘরের ভাড়া ও দিয়ে দিল। ক্লান্ত লাগা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল ওর কোন খবর আছে কিনা।

হোটেলের লোকটা ওর হাতে একটা খাম দিল। হোটেলের নিয়মানুযায়ী তিনটে ফর্ম পূরণ করে সময় উল্লেখ করতে হয়। রাতে পুলিশ এসে এক কপি নিয়ে যায়। কিন্তু মার্টেল ফর্ম পূরণের ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখালোনা, কারণ ও এখানে আছে এটা অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা গোপন রাখতে চাইছিল।

অবশেষে ঘরে ঢুকে খামটা খুলল। মেয়েলি হস্তাক্ষরে লেখা রুম নম্বর বারো। ও দ্রুত গিয়ে দরজায় টোকা মারল। মেয়েটা দরজা খুলতে মার্টেল ঘরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে দিল।

পরস্পর বন্ধু?

–ডেভিড নাগেল।

আমি তোমাকে স্টেশনে জানালা দিয়ে আগেই দেখেছি। এজন্যে তুমি অবশ্য আমাকে দোষ দিতে পারো না।

যাইহোক সাবধান হওয়া উচিত, আমি এখন ক্লান্ত...।

–দেখেই বুঝতে পারছি।

হাতে যে তোয়ালেটা ছিল ওটা সরাতেই মিলিমিটারের একটা পিস্তল দেখা গেল। ওটা বালিসের তলায় রেখে দিয়ে বলল, তোমার তেষ্টা পেয়েছে।

–আমি বোতলের জল খাবো।

বিছানায় উঠে বসে মার্টেল মহিলাকে ভালো করে একবার দেখে নিল। বেশ লম্বা, আকর্ষণীয় চেহারা, কালো চুল, চোখ দুটো নীল।

তুমি আমার পরিচয়ের প্রমাণ চাইবে।

বলেই পাসপোর্টটা বের করে ওর হাতে দিল। মেয়েটাও ওর পরিচয়পত্র দেখাবার চেষ্টা করল। জুরিখের গিসেলা জোবেলকে ও নিজেই চেনে। যাইহোক অন্য একটা মেয়েকে ও বাঁচিয়েছে। ওর চোখের সামনে সেই আবর্ত দ্বিগুণ বেগে ঘুরে চলেছে। মেয়েটা চলে যেতে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

***

খুব সাবধানী মেজাজে ওর ঘুম ভাঙলো। ও নিশ্চিত নয় যে ও এখন কোথায় আছে। চারিদিক অন্ধকার। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে গেছে।

হঠাৎ ওর গায়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। ওর মনে হল যেন কেউ ঘরে রয়েছে। ওর টাই, শার্ট, জুতো খুলে নিচ্ছে। কোন শব্দ না করে মাথাটা ঘুরিয়ে ডান হাতটা সামনের

দিকে এগোল। আলো আসার আগেই একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর বলে উঠল,–তুমি ঠিকই আছো। সেন্ট গ্যালেনের মেট্রোপল হোটেলেই তুমি আছো। আমি ক্লেয়ার হফার। এখন ভোর চারটে। তুমি দুঘণ্টা মাত্র...।

–ঠিক আছে তাতেই হবে।

মার্টেলের গলা শুকিয়ে কাঠ। ও উঠে বসল। দেখল হারের পরনে ধূসর রঙের টু-পিস্ স্যুট।

বিছানার ধারের টেবিলে তোমার পিস্তল আছে, ওটা নিয়ে ভাল ঘুম হয়। যাই হোক দরজা একেবারে বন্ধ।

–তুমি সব কিছুই ভাবছো? মার্টেল হারের কথায় বলে উঠল।

জুরিখ অ্যাপার্টমেন্টের কথা মনে আসতে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল মার্টেল।

–কি চিন্তা করছো?

এই যে...। বলে মার্টেল থেমে গেল। তারপর শার্টের পকেট থেকে ডেলটা ব্যাজটা যেটা বহফস্ট্রাসেতে মৃতের পকেট থেকে পেয়েছিল, ওটা হফারের সামনে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিল। হফার প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। আতঙ্কে চোখদুটো কেমন বড় হয়ে গেল।

–তুমি এটা কোথায় পেলে?

মেয়েটা সত্যিই চতুর আর চটপটে। কয়েক সেকেন্ডর মধ্যেই ওর দিকে পিস্তল তাক করলো।

ব্যাজটা দেখে ভয় পেয়েছো?

–তুমিই তো এখন ভয় পাইয়ে দিচ্ছো। গুলি করতে আমার কোনরকম দ্বিধা...।

–আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

টেবিলের ড্রয়ারের দিকে ওর হাতটা সরিয়ে নিলো। মহিলার কথায় বা ব্যবহারে কোনরকম নম্রতা নেই।

–গতরাতে আমি বহফস্ট্রাসে একটা মৃতদেহের পকেট থেকে এটা পেয়েছি। আমি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কখন বেরোবো, এই ভরসায় অপেক্ষা করছিল। ডেলটা, তোমাদের কোন লোকেদের মুখোশ ছিল না। ওদের প্রত্যেকের পকেটে একটা করে ব্যাজ। জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে যায়।

তুমি বলছ রক্ত', আবার বলছো আমাদের'...।

–সেন্ট্রাল হক–এ আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করনি কেন? ও দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

-ওয়ার্নারের খুনের পরে ডেলটা ইনভেস্টিগেশন থেকে আর্নল্ড আমাকে তুলে নিতে চেয়েছিল। সেকারণেই আমি আন্ডার গ্রাউন্ডে এসেছি। সম্ভবতঃ লিসবেথ তোমাকে

এখানে এনেছে, তোমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা নিশ্চিত হতে। আর্নল্ডের অনুসরণকারীদের কাউকে কাউকে ও চেনে।

এছাড়া ও স্বয়ং ফার্দি আর্নল্ডকেও চেনে?

না, ওদের কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। কেন বলতো?

ও এবার আর্নল্ডের বর্ণনা দিল। তিরিশের ওপর বয়েস। বাদামী চল, ধসর চোখ...।

–কিন্তু?

–আমরা অ্যাপার্টমেন্টে আছি এটা কেউ ওকে বলেছে বোধহয়। লিসবেথকে আমি সন্দেহ করি। কারণ ও নোটবুক থেকে নাম্বারটা নিয়েছিল। ব্যাপারটা ও জেনেছিল। আমার আসার আগেই সম্ভবতঃ আর্নল্ড ফোন করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটা বুঝিয়েছিল। কে...?

খুব সতর্কভাবেই শব্দগুলো ব্যবহার করছিল। বললো, সেই মহিলা যে তোমাকে নামিয়েছিল।

–ওর বিয়ের আগে আমরা দু'জন ডেভিড নাগেলের কাছে আই. বি. পুলিশে কাজ করতাম। আমরা একদিন ওর সঙ্গে রসিকতা করি। একই পোষাক পরে অফিসে গিয়েছিলাম দশ মিনিটের তফাতে। ও তো তফাৎ ধরতেই পারেনি। আমরা ব্যাপারটা

বলাতে ও ভীষণ রেগে গেল। তোমরা যে বোকা বনে যাবে এতে অবাক হবার কিছু নেই।

ওর মধ্যে আস্থার ভাব দেখা গেল। পিস্তলটা বালিশের তলায় রেখে দিল। মৃদু হেসে ও প্রশ্ন করল, লিসবেথ কোথায়? ও কি জুরিখের ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনে অপেক্ষা করছে?

-ও এলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। মনে ভাববে আমার বোন, কিন্তু ও আমার কেউই নয়।

***

এদিকে লন্ডনে টুইডের চোখ ফাইলে নিবদ্ধ। আতঙ্কজনক খবরটা কখন পেয়েছিল, সেটাই ভাবছিল। ওর-সহকারী মিস্ ম্যাকনেইল একটা খবর দিল।

একটা সুন্দরী মহিলার দিকে রাস্তার লোকেরা তাকিয়ে দেখছিল। ও যে কে তা কেউই জানেনা। একমাত্র টুইডই চেনে। ওর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

-বেইরুট থেকে এসেছে।

অ্যালার্ম বেলটা বাজতে লাগল। টুইড ড্রয়ার খুলে কোড নম্বর দেখে নিল।

সেই মুহূর্তে সিগন্যালটা আবার স্বাভাবিক বাজতে লাগল।

বেইরুট হচ্ছে ব্যাভেরিয়ায়। লিন্ডাউ ওয়ার্নারের শেষ জায়গা।

ম্যাকেনেইল বলল, তোমাকে একটু একা পাওয়া যাবে?

না, আমি এখন...।

কাজের শেষে টুইড ওর দিকে তাকালো। চোখের দৃষ্টি একেবারে শূন্য।

–কোন খারাপ খবর?

–খুবই খারাপ।

–তুমি সেই পোষাক পরবে। পরো...।

-আমি ওরকম ঢাকা দেওয়া পোষাক পরি না। পূর্ব জার্মান থেকে ব্যাভেরিয়ার সীমান্ত ম্যানফ্রেড সবেমাত্র পেরিয়েছে। ওঃ।

টুইড সিগন্যাল পড়া মাত্রই কেমন হয়ে গেল। ও মানসচোখে রুটটা দেখতে পেল। স্টেটের সিকিউরিটির জন্যে প্রথমে মন্ত্রীসভার মধ্যে ওর এজেন্ট ঢোকানো আছে লিপজিগ অর্থাৎ পূর্ব জার্মানীতে। ওর মোবাইল ট্রান্সমিটার থেকে একটা রেডিও ম্যাসেজ করা হল। বেইরুটের টুইডের স্টেশন থেকে সংগ্রহ করা হলো।

বেইরুট থেকে একজন দূত দ্রুত গাড়িতে বসে বৃটিশ অ্যামবাসীতে এলো। সেখানে সিকিউরিটির কাছে ব্যক্তিগত ভাবে সিগন্যালটা দেওয়া হলো। এরপরে ওটাকে পার্ক ক্রিসেন্টে ঘোরানো হলো। সিগন্যালটা কোনরকম কোড করা ছিল না। ওটাতে যা ছিলঃ

ম্যানফ্রেড আজ বুধবার সাতাশে মে পশ্চিম জার্মানীর হফ’-এর কাছে পূর্ব জার্মান অতিক্রম করেছে। চরম গন্তব্য এখনও অজানা।

কোন কথা না বলে ম্যাকেনেইলকে সিগন্যালটা দিলো। এরপর দেওয়ালের মানচিত্রের দিকে এগিয়ে গেল। পরীক্ষা করে নিল যে ম্যানফ্রেড কোন্ রুটটা বেছেছে।

হফ-এর আঞ্চলিক সীমা থেকে একটা অটো দক্ষিণে দৌড়োচ্ছিল। নুরেমবার্গ হয়ে গন্তব্য ব্যাভেরিয়ার রাজধানীতে। এখান থেকেই হাউপ্টব্যানহফের ওপর বিশেষভাবে নজর রেখেছিল। কিন্তু কেন কে জানে? ও ওর ঘোরানো চেয়ারে ফিরে গেল।

আমরা তো ম্যানফ্রেডের ব্যাপারে বেশী জানি না, তাই না? ম্যাকনেইল বলল।

আমরা কিছুই জানি না এবং আমরা অনেক কিছুই জানি। টুইড ভ্রূ কুঁচকে বললো। একটা ফাইল নাড়াচাড়া করছিল ও।

বুড়ো বয়সে আমি মানসিক রোগী হয়ে যাবো। তুমি যখন সিগন্যালটা আনলে তখন আমি ওর দিকে দেখছিলাম।’

-হা, ও হচ্ছে উঁচু দরের পূর্ব জার্মান এজেন্ট, তাই না। ওর জাতিগত বিষয়ে খোঁজখবর চলছে। প্রথম শ্রেণীর কুশলী গুপ্তঘাতক, নিখুঁত পরিকল্পনায় ওস্তাদ। সত্যিই অস্বাভাবিক গুণের। কিন্তু কালেসি একজন অস্বাভাবিক চরিত্রের। টুইড চশমাটা চোখের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল।

তুমি কি সত্যিই ভাবো ও কালেসি? ওর ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি।

আমেরিকানরা অনুমান করছে কিছু, কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত। আমি বুঝিনি ডেলটা হচ্ছে নয়া নাজীদের...।

ম্যানফ্রেড হচ্ছে বেশীর ভাগ বড় ধরনের নাশকতামূলক অপারেশান ফ্রিল্যান্স কমিউনিস্ট এক্সপার্ট। তাহলে অপারেশান ক্রোকোডাইলের পেছনে কে আছে?

-তোমাকে সত্যিই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। কফি করবো, খাবে?

টুইড ডেস্কের ফোনের দিকে এগিয়ে গেল।

–ঈশ্বরের দোহাই, মার্টেল চলে এসো। দেরী হবার আগেই তোমার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নাজী আর কমিউনিস্ট দু'দিক দিয়েই তোমার বিপদ।

***

এটসট্রাসেতে মিউনিখ পুলিশের হেড কোয়ার্টারের কাছেই বড়ো বিল্ডিং। ওরই একটা অন্ধকার অ্যাপার্টমেন্টে দস্তানা পরা একটা হাত ফোনটা তুলল। দস্তানাটানাইলনের। ও একটা নাম্বার ডায়াল করলো। তখন ভোর চারটে।

–কে বেজন্মা? সময় সম্পর্কে কোন ধারণা নেই...? রেইনহার্ড দিয়েত্রিচের ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেই ও রেগে গেছে। যদি ভি হয় তাহলে আবার ও কেটে...না।

–ম্যানফ্রেড বলছি।

কণ্ঠস্বর সংযত ও বিনয়ী। আবার বলল ম্যানফ্রেড, শুনলাম তোমার নাকি কি একটা সমস্যা যার ফলে আমরা অসুবিধেয় পড়েছি।

দিয়েত্রিচ দ্রুত উঠে বসলো। জুরিখের ব্যাপারটা ও কিছুটা জানে। কণ্ঠস্বর নরম করে বলল, এমন কিছু নয় যে আমরা চালাতে পারবো না। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি–

কিন্তু জুরিখে ব্যাপারটা ভুলভাবে চালানো হয়েছে। তাহলে আমরা পরবর্তী সেন্ট গ্যালেনে কি আশা করতে পারি?

ম্যানফ্রেডের জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনে দিয়েত্রিচের মনে আতঙ্ক জেগে উঠল।

ম্যানফ্রেড যখন কম দামে স্টাটগার্টে অস্ত্রশস্ত্র আর পোষাক সাপ্লাই করার প্রস্তাব দিল তখন ও প্রায় সুযোগটা লুফে নিয়েছিল। কিন্তু ও এখন দুঃখিতভাবেই সিদ্ধান্ত নিলো যে, ব্যাপারটা অনেক দেরী হয়ে গেছে।

-তোমাকে সেন্ট গ্যালেনের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না।

অদ্ভুত স্বরে আবার বলল, আমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবার সব বন্দোবস্ত ইতিমধ্যে করে ফেলেছি।

–শুনে খুশী হলাম। একই ওয়ার হাউস থেকে কিন্তু সংগ্রহের জন্য আরো অস্ত্রশস্ত্র আর পোষাক পাওয়া যাচ্ছে। কোথায় আর কখন তুমি এগুলো নেবে?

দিয়েত্রিচ ওকে বললো, এবারে একটা ক্লিক শব্দ হলো তার ফলে শিল্পপতি বুঝলো ম্যানফ্রেড আর লাইনে নেই। একগুঁয়ে, বদমাস, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মিলেছে। ঈশ্বর জানে যে ওরা অনেক নষ্ট করেছে। কেমন করে বি. এন. ডি-র এরিখ স্টোলার জায়গাটাকে অনুসরণ করল বুঝতে পারছেনা।

এদিকে মিউনিকে ম্যানফ্রেড ডেকের আলোটা নিভিয়ে দিল। পশ্চিমের ও যেখানেই থাকুক না কেন সব সময় দস্তানা ব্যবহার করে। তাহলে এপার্টমেন্ট ছাড়ার পরে কোথাও আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে না। ওর মুখের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা হাসি। পরিকল্পনানুযায়ী অপারেশান ক্রোকোডাইল এগোচ্ছে।

***

লিসবেইথের খুনের ব্যাপারটা মার্টেল হফারকে বলতেই ও কেমন হয়ে গেল। মেট্রোপল হোটেলের শোবার ঘরে তখন ওরা দু'জনে। ও অবশ্য একটা ব্যাপার বললো না যে ওকে রীতিমত অত্যাচার করা হয়েছে।

হঠাৎ ক্লেয়ার ওকে চেপে ধরলো। বলল, ও তোমার জন্যেই ওদের হাতে ধরা পড়েছিল। হারামজাদা।

বলার পরেই ও মার্টেলের গালে একটা চড় মারলো। আবার মারতে যেতেই ওর হাতটা ধরে বিছানায় শুইয়ে দিল।হঠাৎ মার্টেলের মনে পড়ল গিসেলা জোবেলের সঙ্গেও ঠিক এরকমই একদিন হয়েছিল, সেন্ট্রাল হফের অ্যাপার্টমেন্টে।

কিন্তু এ মেয়েটা আলাদা। মেয়েটা রুক্ষ কিন্তু আবার ব্যবহার সংযতই বলা যায়। বিছানার পাশের আলোতে ওর চোখ দুটো বেশ বড় দেখাচ্ছে। ও ওর কপালে একটা চুমু খেলো, তাতেই মেয়েটা নরম হয়ে গেল।

–অন্ততঃ এক ডজন ডেলটা সশস্ত্র সৈন্য আক্রমণকারী ছিল। মার্টেল নরম স্বরে বললো। দুটো গাড়িতেই সবাই ছিল। আমি তিনজনকে গুলি করেছি। ওরা সবাই মার্সিডিসের মধ্যে লিসবেইথ-এর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমি তখন ব্যবস্থা নিলাম...।

–এক ডজন সশস্ত্র...। মেয়েটার চোখ দুটো বড় হয়ে গেল। কিন্তু তুমি কেমন করে লিসবেইথকে রক্ষা করতে পারলে? কেনই বা ঘটনাটা ঘটালো, ওকেই বা নিয়ে গেল কেন?

–ওরা তোমার ব্যাপারে সন্দেহ করেছিল।

–আমি কেন?

–বড় একটা কিছু হচ্ছিল বোধহয়। তাহলে যে এজেন্টরা একটু অন্য গাইছে তাদেরই ডেলটা বিচ্ছিন্ন করছে। প্রথম নাম চার্লস ওয়ার্নার। তারপর তুমি, আমি ওদের তৃতীয় লক্ষ্য। লিন্ডার্ড থেকে সুইজারল্যান্ড পর্যন্ত কেনই বা ওয়ার্নার ট্রেন ব্যবহার করলো না, কেন নৌকতে গেল?

–ও নৌবাহিনীর প্রাক্তন লোক ছিল, বলেছিল, ট্রেন ট্যাপ হতে পারে। আচ্ছা আমরা ঐ লোকগুলোকে প্রত্যাঘাত করতে পারিনা?

–আমরা সেটাই করতে যাচ্ছি। আর সেজন্যই আমার গন্তব্যস্থল সেন্ট গ্যালেন। ওখানে এমব্রডারী মিউজিয়াম খুবই কম তাই না?

–হুঁ, বলে চুলগুলো আঁচড়াতে লাগল ও। বললো, জায়গাটাকেই ডেলটার ব্যাপারে চার্লস রাঁদেভু হিসাবে ব্যবহার করত, তুমি কিভাবে জানলে?

–আমরা ফিরে আসি। তুমি জানো ডেলটার কতখানি গভীরে ওয়ার্নার ঢুকে গিয়েছিল?

আমি যেরকম বলেছি, সেইরকমই। ওর মনের ভেতরটা তো আমি জানিনা। চার্লস নিজেকে অনেকখানি পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

থেমে আবার বলল, ওর ছদ্মনাম স্ট্যাল। যাইহোক তুমি ডেলটার হালফিলের খবর দেখেছ।

ও একটা খবরের কাগজ ওকে দিল। আগের দিনের কাগজ। একটা হেডলাইন পড়েই ও রীতিমত চমকে উঠলো।

এ্যালগাউতে নয়া-নাজীদের নতুন সংগ্রহ অস্ত্রশস্ত্র আর তৈরি পোষাক পাওয়া গেছে।

খবরটা খুবই সাধারণ। বিশেষ সূত্র ধরে ব্যাভেরিয়ান পুলিশ ভোরে একটা খামার বাড়িতে হানা দিয়ে অস্ত্রের একটা ভাণ্ডার পায়। ফার্ম হাউস এখন কর্মব্যস্ত কিন্তু তল্লাসীর সময় তা ছিলনা।

ক্লেয়ার বলল, গত চার সপ্তাহে ওরা ডেলটার এরকম অস্ত্র রাখার সাত নম্বর ক্যাম্প খুঁজে পেয়েছে।

ব্যাপারটা যেন কিরকম!

–কি ভাবছো? তোমাকে আবার সেরকম দেখাচ্ছে?

মার্টেল দেওয়ালের দিকে তাকালো। টুইডের সঙ্গে কথোপকথোনের দৃশ্যগুলো ওর মনে ভাসছিল।

ওয়ার্নারের দেহের মধ্যে ব্যাজ পাওয়া গেছে। ওরা কাজ শেষ করে ওর পেছনে ডেলটা প্রতীক এঁকে দিয়েছিল।

ভাবনা থামিয়ে মার্টেল বলে উঠলো, আমার মনে হচ্ছে কোন একটা ব্যাপার আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি।বলে ঘড়ি দেখল, সাড়ে চারটে। আবার বলল, কিন্তু আমরা বদমাইশগুলোকে ফাঁদে ফেলতে পারি। সেন্ট গ্যালেনে এমব্রডারী মিউজিয়াম আছে। এখান থেকে আট ঘণ্টা কম সময়ে

কথা শেষ হলো না। হফারের দিকে তাকালো ও।

***

বৃহস্পতিবার আঠাশে মেঃ

–হ্যাঁ, এই ব্যাপারেই আমরা কথা বলছি। আমি আশা করি।

ডাইনিংরুমে ব্রেকফাস্টের সময় মার্টেল ওকে কমলা রঙের একটা টিকিট দিল।

জার্মান ভাষায় কি যেন একটা সংখ্যা লেখা আছে।

–মরার সময়ে ওয়ার্নারের ওয়ালেটে এটা ছিল।

ক্লেয়ার বলল, এটা তো গ্যালেনের এমব্রডারী মিউজিয়ামে ঢোকার টিকিট। বিল্ডিংটা পুরোন শহরে। হেঁটে দশ মিনিট।

–পেছনে দেখ।

ক্লেয়ার টিকিট উল্টে লেখাটা দেখল। লিন্ডাউ যাত্রার সময়ে এটাই ওর শেষ হস্তাক্ষর।

এস. টি. এগারো পঞ্চাশ, মে আঠাশ।

–মে আঠাশ,...অর্থাৎ আজ..ঘড়িটা দেখল, বলে উঠল, ন'টা। এস. টি. অবশ্যই স্ট্যাল-এর জন্যে অপেক্ষা করবে। আমাদের ওখানে গিয়ে কথা বলতে অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক লাগবে।

-কিন্তু মার্টেল একাই যেতে চায়। বলল, ও গেলে কাজ নাও হতে পারে।

ক্লেয়ার পাল্টা জবাবে বলল, তোমাকে ও চিনবেনা।

মার্টেল শান্তভাবে বলল, শোন ক্লেয়ার, সংবাদ জোগাড়ের এর থেকে ভাল উপায় আর নেই।

একটু থেমে আবার বলল, আমি একা কাজ করতে ভালবাসি। আর আমি মনে করি এটাই উত্তম পদ্ধতি।

আবার থামলো, তারপর মার্টেল আবার বলল, জুরিখে এসেছি কিন্তু কোথাও কিছু ঘটেনি। সেন্ট্রালহকের অ্যাপার্টমেন্টে ডেলটা একটা মেয়েকে দিয়ে আমাকে বাইরে বের করে দিয়েছিল। কাপবোর্ডের কাছে আরোও একজন মেয়েকে আমি ভেবেছিলাম হফার।

–আমি তো বলেছি কেন এরকম, বলতে গিয়ে ক্লেয়ারের চোখ এড়ালো না। বললো, এরপর ব্যানহফস্ট্রাসেতে যা ঘটলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সবকিছু উবে গেল?

ক্লেয়ার বলল, ঐ ফার্দি আর্নল্ডের স্কোয়াড।

–আবার আসবে?

–তুমি বলছো যে আগেই ভেবেছিলে ওরা সমস্ত কিছু পরিষ্কার করেছিল, যাতে ট্যুরিষ্টরা ভয় না পায়। আর্নল্ডের স্পেশাল টিম আছে যেমন ইঞ্জিনিয়ার, বিল্ডার সবাই। আর এরা সবাই পাকা লোক।

মার্টেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর্নল্ড এমন বলেছিল ব্যাপারটা কিছুই নয়।

–এইরকম বানানো গল্পতে নাগেলের গোয়েন্দারাও ভুল বুঝেছিল। তুমি কি সত্যিই মনে করো স্ট্যাল-এর সঙ্গে আমার কথাবার্তায় কিছু লাভ হবে?

–হুঁ, হফার বলল।

–আমি এগারোটা পঁয়তাল্লিশে আসবো। তুমি জায়গাটা দেখাবে।

–এগারোটা পঞ্চাশ।

–তাহলে আমি পাঁচ মিনিট আগে এসে অপেক্ষা করে দেখবো, ঘরে কেউ ঢুকেছে কিনা। ওয়ার্নারও অনুসরণ করতে পারে।

–ও সতর্কই। এখন ও একেবারেই মৃত তাই না।

***

মিউনিখের ম্যাক্স মিলিয়ানস্ট্রাসের রাস্তাটা বেশ চওড়া। ম্যাক্স জোসেফের দিকে হয়ে সোজা ব্যাভেরিয়ার স্টেট পার্লামেন্টের দিকে চলে গেছে। সামনে ইমার নদী। পূর্ব তীরে

পৌঁছতে গেলে দুটো বড় ব্রীজ পেরোতে হয়। প্রথম ব্রীজটার তলাতেই দেহটা পাওয়া যায়।

সেন্ট গ্যালেনের মেট্রোপলে মার্টেল যখন ব্রেকফাস্ট করছিল তার ঠিক ঘণ্টা দুয়েক আগে দেহটা পাওয়া যায়। মার্টেল যখন ব্রীজটা পেরোচ্ছিল একজন উকিল ওর দিকে তাকিয়েছিল।নদীর চারটে বড় থামের একটার তলায় দেহটা ছিল।

একজন ডুবুরী খবর দিয়েছিল, মাথায় গুলি করা একটা মৃতদেহ এখানে আছে। তখন ক্রিমিনাল পুলিশ একজন ডাক্তার নিয়ে এলো। নদীর তীরেই প্রাথমিক পরীক্ষা হলো।

কয়েক মিনিট পর ইন্সপেক্টর ক্রুগার ডাক্তারের দিকে তাকালো।

ডাক্তার বলল, মাথায় তিনবার গুলি করা হয়েছে। পোড়া পাউডারও পাওয়া গেছে। দড়ি-টড়ি পায়নি। তাই দড়ির ফাঁস আটকে ওকে মারেনি।

–আমি ওকে সনাক্তকরণের জন্যে পোষাকগুলো দেখতে পারি ডাক্তার?

ক্রুগার অভ্যস্ত হাতে দ্রুত পরীক্ষা করতে লাগল। ওর সহকারী ওয়েইল চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। ওর চীফের পরীক্ষা শেষ হল। একটা রিষ্টওয়াচ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ঘড়ির পেছনে একটা মাত্র শব্দ এনগ্রেভ করা। শব্দটা হচ্ছে স্ট্যাল।

***

মার্টেল আর ক্লেয়ার এমব্রডারী মিউজিয়ামে গায়েগায়ে এগোচ্ছিল আর নানারকম কথাবার্তা বলছিল। ডেলটার প্রসঙ্গ উঠেছিল। আর্নল্ড ওকে খুঁজছে এ ব্যাপারে দু'জনেই ওয়াকিবহাল।

মার্টেল একবার বলল যে, মিউজিয়ামের মধ্যে ওর সঙ্গে হারের না যাওয়াই ভাল। সে কথা শুনে হফার রীতিমত খাপ্পা হয়ে উঠল। তারপর খানিকটা নরম হয়ে মার্টেলকে রিভালভার নিয়ে যাবার জন্যে বলল।

ওরা সেন্ট গ্যালনে যাবার সংকীর্ণ জায়গাটা দিয়ে এগোচ্ছিল। দু-পাশে ঢালু জায়গা। এলাকাটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন গত শতাব্দীর।

বাতাসের গন্ধে ঝড় উঠবে বলে মনে হলো।

মার্টেল খুব আস্তে প্রবেশমুখের দিকে এগাছিল। চোখ দুটো সতর্ক। পাশের দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখল একজন সুবেশা মহিলা বসে আছে।

ও বললো, পুলিশ স্টেশন সামনেই আছে তাই না?

হফার জবাবে জায়গাটা ওকে বলে দিলো। ওরা দ্রুত এগোতে লাগলো। এমার্জেন্সীর বিষয়টাও হফারের কাছ থেকে ভাল ভাবেই জেনে নিলো।

দোকান ছাড়িয়ে ও মিউজিয়ামের দিকে দ্রুত কথা বলতে বলতে এগোতে লাগল। জায়গাটায় পৌঁছল। গাড়িটা থামালো। ক্লেয়ার বলল, আমি এই জায়গাটাতে থাকি। কেউ ঢুকলেই দেখতে পাবো।

মিউজিয়ামের প্রবেশ মুখের ঠিক সামনেই জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখালো। চওড়া রাস্তার ওপর কমলা রঙের একটা বুথ।

সামনে কালো পর্দা ঝুলছে। বুথের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা প্রনটোফট পাসফোটাস।

ক্লেয়ার বলল, যাবে যখন, তখন আমাকে ডেকে নিও কিন্তু।

মার্টেল চারিদিকটা একবার দেখে নিল। মিলিয়ানস্ট্রাস অতিক্রম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

***

ক্লেয়ারের বর্ণনা মত ব্যাপারটা এইরকম। সিঁড়ি দিয়ে গেলে বিরাট একটা হল। সামনের কাউন্টার থেকে একটা টিকিট নিলো ও। ওয়ার্নারও এই টিকিট নিয়েছিল। মুখটা খানিকটা রুমাল দিয়ে ঢাকা দিয়েছিল, যাতে সামনের মহিলাটি ওকে চিনতে না পারে।

মিউজিয়ামের দোতলায় একটা নোটিশ। ও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখল ভীষণ ফাঁকা জায়গাটা। এজন্যই ওয়ার্নার ডেলটার সঙ্গে এখানে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল। বাইরের প্লেটে খোলার সময় লেখা আছে। বাঁদিকে লাইব্রেরী।ও সন্তর্পণে গিয়ে দরজাটা ঠেলে

দেখল, বন্ধ আছে। আবার দ্রুত মিউজিয়ামের দরজা খুলে ঢুকল। নিস্তব্ধ ঘর। ঢুকে দরজাটা আস্তে বন্ধ করে এগিয়ে গেল।

কাঁচের বাক্সে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে।

জায়গাটা ফাঁকা দেখে দ্রুত সমস্ত কুলপীগুলো দেখতে লাগল। এরপর ও কোল্টটা খুলে মুখে সাইলেন্সার লাগালো। ঠিক যখন ঘড়িতে এগারোটা পঞ্চাশ', ও আস্তে আস্তে দরজার হাতল ঘোরালো।

চারিদিকটা দেখতে লাগল মার্টেল। পেছনে রিভলভার। দরজা খানিকবাদে খুলল। মার্টেল ভিতরে ঢুকল।

ওর কানে ক্লিক' জাতীয় একটা শব্দ এলো। খুব সন্তর্পণে ও নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। মাঝে মাঝে ইঁদুরের চলাফেরার শব্দ পাচ্ছিল।

ঠিক সেই সময়ে নতুন আগন্তুক স্ট্যাল চোখের সামনে আসছে। মার্টেল তাকালো। প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কালরা সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সামনের লোকটার গায়ে ওভারকোট। কোটের কাছে একটা রূপোর ব্যাজ লাগানো, প্রতীক চিহ্ন ডেলটা।

ওর ডানদিকে একটা ফেল্ট-টিপ, পেন জাতীয় বস্তু।লোকটা মার্টেলের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। মার্টেল হাত শক্ত করে সামনে এগোলো। লোকটা ছুঁচলো জিনিষটাকে

মার্টেলের পেট লক্ষ্য করে ধরে আছে। হঠাৎ মার্টেল দুবার ফায়ার করলো। চারিদিকের নৈঃশব্দ ভেঙ্গেশব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

এদিকে সেই লোকটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা ফেলে দিল। ছিটকে পড়লো কাঁচের বাক্সের ওপর। রক্তের ধারায় মুখমণ্ডল বীভৎস হয়ে উঠল।

মার্টেল না দেখেই জায়গাটা ত্যাগ করলো। রিভলভার ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো। কাউন্টারের মেয়েটা পিছন ফিরে আছে। দ্রুত রাস্তায় এসে পড়তে হবে।

কিন্তু রাস্তাতেই অপেক্ষা করছিল ডেলটা।

ওরা একটা লোককে ভিতরে পাঠিয়ে অনেকে বাইরে অপেক্ষা করছিল। এটাই ওদের সংস্থার কাজের ধারা।

ব্যানহফস্ট্রাসের ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা মার্টেল ভোলেনি। ও দরজাটা খুললো।

বাইরে এসে ক্লেয়ারকে খুঁজতে লাগল। কোথায় ও? আস্তে আস্তে এগোতে থাকল।

সমস্ত ব্যাপারটায় সতর্কতা প্রয়োজন।ও একটা সিগারেট ধরিয়ে বুথের সামনে এসে দাঁড়ালো। পর্দার ভেতরে চোখ রেখে দেখল, কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। কথা আরম্ভ হল।

–ওরা ডেলটা অপারেটিভ পাঠিয়েছিল। মিউজিয়ামের মধ্যে মরে পড়ে আছে। আমাকে দু মিনিট সময় দাও। তারপর মেট্রোপলে যেও। ওখানে আমি যতক্ষণ না তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি–হুঁ।

এরপরে ও চলে গেল। একটা পুরনো শহর ওর গন্তব্যস্থল। দোকানপাট নতুন। জায়গাটা প্রাচীন বলে ওর এখনও মনে আছে। ও রাস্তাটা ধরে এগোতে লাগল।'নিউগ্যাসে পাঁচ' ক্লেয়ার বলেছিল।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার। ও এগোতে এগোতে জানলার দিকে একবার তাকালো। ওর ধারণা নেই জায়গাটায় কি কি বিক্রি হয়। তাই চারদিকে দেখতে লাগলো। অপর দিক থেকে লেদে চামড়ার একটা লোক এসে দাঁড়ালো। হাতে বড় একটা ব্যাগ আর ঠোঁটে সিগারেট। ওর লাইটার জ্বলতেই মার্টেল এগিয়ে গেল।

ইংরেজের রক্ত ওর গায়ে। সেই লোকটার ছায়া ক্রমশ ওর দিকে এগোচ্ছিল। ও এগোতে লাগলো।

স্ট্যাড পোলিজি। এবড়ো-খেবড়ো ধূসর দেওয়াল। সাটারটা দেওয়াল ঘেঁষে। জায়গাটা দেখতে অর্ধগোলাকার। ও এগোল।

একটা বিশিষ্ট জায়গায় ও এলো যেটা ক্লেয়ার ওকে ম্যাপে দেখিয়েছিল। মনে পড়ল, জায়গাটা মার্কেট গ্যাসে।

ও এবারে বাঁ দিকে বেঁকে গেল। মুখোমুখি দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। অন্য একটা দোকানের জানলা দিয়ে হলদেটে চামড়ার লোকটা তাকিয়ে আছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলযোগ হয়েছে।

ব্যাপারটা আগেই গেজিয়েছে। একটা লোক অন্ততঃ একশো গজ দূরে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে। মার্টেল ধৈর্য সহকারে দেখল। ওদেরও ইচ্ছা মার্টেলের নজরে আসা।

অন্য সময়ে হলে না হয় কথা ছিল। সামনে বিপদ! সাবধান!

ও কাঠের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। দূরে অর্থাৎ রাস্তার মাঝখানে ছেলেদের তৈরী একটা খেলনা ট্রেন। ড্রাইভারও আছে।

হলদেটে চামড়ার লোকটা একভাবে জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। সামনে মহিলাদের ব্যবহার করা পোষাক। মার্টেল দ্রুত এগিয়ে গেল। ট্রেন তখনও চলেনি। সামনে বড় বিল্ডিং। ওটা একটা হোটেল। ওখানেই ক্লেয়ার আছে। ও রাস্তা পেরিয়ে সকলের দিকে তাকাতে তাকাতে এগোতে লাগল।

ও খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হোটেলের পাশটা পেরোতেই হুইসেল শোনা গেল। ও ক্রমশঃ ট্রেনটার দিকে এগোতে লাগলো। একেবারে শেষ কোচটায় ও দেখতে পেল স্বয়ং ক্লেয়ার হফারকে।

ওদের দুজনের পাশে একটি কমবয়েসী মেয়ে দুটো বাচ্চা নিয়ে বসে। ক্লেয়ার মার্টেলের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু একি? ওর রিভলভারটা যেন ওরই দিকে তাক করা।

মার্টেলের মনে হল ওর বাঁদিকেও যেন কেউ আছে। ট্রেন থেকে অদূরে মার্টেলের চোখ পড়তে ওর মনে হল যেন একজন লম্বা মহিলা আছে। মাথায় কালো টুপি। মুখে একটা আবরণ। কাঁধে একটা ব্যাগ ধরা। ডানহাতে ঘুমুখো হাইপোডারমিক।

এদিকে সেই হলদেটে চামড়ার লোকটা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, আড়ালে থাকতে। ও যথেষ্ট সতর্ক হলো।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা শব্দ হলো, গাড়ীর হর্নের শব্দ। শব্দ শুনে মহিলাটি পাশের দেওয়ালে আত্মগোপন করলো। ওর ভি-কাট পোষাকের মাঝখানে একটা ছোট্ট গোল গর্ত।

মহিলাটি টুপীটা খুলে মুখের আবরণটাও সরালো। মার্টেল মুখে বিরক্তি নিয়ে এগোবার চেষ্টা করলো। কিন্তু একি! এ তো গিসেলা জোবেলের সেই মৃত মুখ।

ট্রেনটা এগোচ্ছিল। ক্লেয়ার একভাবে নিজের জায়গায় বসে। হলদে চামড়াকে দেখা যাচ্ছেনা। চলন্ত ট্রেন থেকে সুইস মেয়েটা তার সম্ভাব্য আক্রমণকারীর ওপর গুলি চালালো। মার্টেল এরকম এনকাউন্টার আগে করেনি। সামনেই মাটির ওপর কিছু যেন একটা পড়ে আছে আর হোটেলের সামনে হঠাৎ ভীড় জমে গেল।

***

বৃহস্পতিবার আঠাশে মেঃ

মেট্রোপলের হোটেলে শোবার ঘরে মার্টেল প্রবেশ করতে ক্লেয়ারের কাঁপুনি কিছুটা কমলো। এবারে ও ভেঙ্গে পড়ল এবং মার্টেলের বুকের মধ্যে মুখ লুকোলো। মার্টেল ওর কালো চুলে হাত বোলাতে লাগল।

পরম নিশ্চিন্ত লাগলো ওর নিজেকে।

–তুমি নির্দেশ না মেনে ফটো বুথে ছিলে অথচ আমি তোমাকে এখানে আসতে বলেছিলাম। তারপর দেখলাম ট্রয় ট্রেনটায়।

-তোমার হয়ে আমি একটা ভাল কাজই করেছি।

একটু থেমে কণ্ঠস্বর পাল্টে হফার বললো, তুমি বলেছিলে না মেয়েটা তোমাকে মারতে চায়নি কিন্তু আমি ওর হাতে ছুরি দেখতে পেয়েছি।

না ওটা ছুরি নয়। ওটা সঁচ মানে হাইপোডারমিক, ডেলটাদের অস্ত্র। তুমি আমাকে খুব জোর বাঁচিয়েছ। স্বাভাবিক গলায় মার্টেল বলল।

ক্লেয়ার খানিকটা শান্ত হলে মার্টেল বলল, তুমি কিভাবে এগিয়েছিলে আমি তো দেখিনি।

একটু থেমে মার্টেল আবার বললো, তুমি যাকে মারলে ওটা গিসেলা জোবেল, সেন্ট্রাল হকের লিসবেথের মেয়ে। ডেলটার নিষ্ঠুরতা চরম সীমায় পৌঁছেছে। প্রথমে ওরা আমাকে মারবার জন্যে মিউজিয়ামে লোক পাঠিয়েছিল, পকেটে ডেলটার প্রতীকও আমি দেখেছি।

–তুমি ওকে ওখানে ছেড়ে দিলে।

হ্যাঁ। আসলে ওদের একটা টীম আছে। ঐটীমেরই লোক হলদেটে চামড়াটা আমাকে বরাবর অনুসরণ করে এসেছে। আর ঐ মেয়েটাতো আমাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল।

মার্টেল হারের দিকে তাকাল।

বুথের ফাঁক দিয়ে আমি ওদের দুজনকেই দেখেছিলাম। সেজন্যই আমি তোমার পেছনে...। ক্লেয়ার বলল।

মার্টেল এবার বলল, নাও এবার আমরা সেন্ট গ্যালেনের ট্রেন ধরবো, সব ঠিকঠাক করে নাও। আমরা এখন পূর্ব ব্যাভেরিয়ার দিকে যাচ্ছি।

–এত তাড়া কেন?

ক্লেয়ারের কথার জবাবে বললো মার্টেল, পুলিশ। ওদের হাতে এখন দুটো খুন। একটা আমি মিউজিয়ামে মেরেছি আর তুমি একটাকে হোটেলের সামনে শেষ করেছে। ওরা ইতিমধ্যেই সেন্ট গ্যালেন ছেড়ে যাওয়া সব ট্রেনে তল্লাসী চালাচ্ছে।

***

মিউনিক এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর কামরায় ওরা দুজন বসেছিল। মার্টেল জানে যে ব্যাভেরিয়ায় ডেলটাদের হেড কোয়ার্টার। সেখানে আরও বিপদ।

সুইজারল্যান্ড ইউরোপের সবচেয়ে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানেও মরণ ফাঁদ পাতা। জুরিখ আর সেন্ট গ্যালেনে যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল ভবিষ্যতে তার চেয়েও কেমন ভয়াবহ হবে তা ওদের জানা নেই।

***

সেন্ট গ্যালেনে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার ফাঁকে টুইডকে লন্ডনে ফোন করলো। সুইজারল্যান্ডে ফোনের অনেক সুবিধা আছে, অসুবিধা ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া মার্টেল এমন সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলে যে কেউ তা টেপ করলেও কিছু বুঝবেনা। এই টেকনিকেই ও টুইডকে সব কিছুই জানালো।

আজকের তারিখ আঠাশে মে, বৃহস্পতিবার। মার্টেল ডেলটার ব্যাপারে টুইডকে সবকিছু জানালো। ডেলটা সুইজারল্যান্ডের ভেতরে খুবই সক্রিয়।...এজেন্ট ব্যবসায়ীর পোষাক পরে থাকে...,ডেলটার প্রতীক পকেটে প্রকাশ্যে থাকে...স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা একেবারেই নেই...নকল আর্নল্ডও গ্রেপ্তার করে...,দুজন হফারের মধ্যে প্রচুর মিল...মনেহয় যমজ বোন...ফার্দি আর্নল্ড রিপোর্ট করেছিল ঐ একজনের দেহ লিমাট নদীর জলে পাওয়া গেছে...,এখন আসল ক্লেয়ারের সঙ্গে যাচ্ছি।

সেন্ট গ্যালেন ছেড়ে ওকে নিয়ে যাচ্ছি ওয়ার্নারের খুনের সন্ধানে–অপারেশন ক্রোকোডাইল...নয়া-নাজী...অবশ্যই যাচ্ছি।

এই হলো টুইডকে পাঠানো মার্টেলের বক্তব্য। টুইড এবার ফোনে ওকে জানালো, বেইরুটের রিপোর্ট অনুযায়ী ম্যানফ্রেড পশ্চিম জার্মানীর হ্রদের কাছে সীমান্ত অতিক্রম করছে। বুঝতে পেরেছো?

তাই নাকি?

রিসিভারটা রেখে মার্টেল স্যুটকেসটা নিয়ে দৌড়ে প্লাটফর্ম পেরিয়ে কামরার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ক্লেয়ার দরজাটা খুলে রেখেছিল। ঢুকে দরজাটা বন্ধ করলো। ট্রেন পূর্বদিকে ছুটে চললো। মার্টেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটা সীটে গিয়ে বসলো।

***

সবেমাত্র বিকেল হয়েছে। মিউনিখ অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের চারতলা। ঘরের ভেতর একজন ডেস্কের ম্লান আলোটা সরিয়ে রাখলো। ফোনের শব্দে ও ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। গ্লাভস জড়ানা হাতে রিসিভারটা তুললো।

–ভিনজ, লিনডাউ থেকে বলছি।

আমরা এখানেই আছি। ম্যানফ্রেড শান্ত গলায় বলল, সেন্ট গ্যালেনের ব্যাপারটা সফল হয়েছে?

–দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, হয়নি। এরউইন ভিনজ বলে উঠলো, কোলহার ওখান থেকে খবর পাঠিয়েছে।

-কেন?

–যার সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল তার তেমন সাহায্য পাইনি। এর ফলে আমাদের দুজন লোক।

ভিনজের ফোন ধরা হাত ঘামতে লাগল।

সবটুকু শোনার পরে ম্যানফ্রেড রাগে ফেটে পড়ল। ওর চোখের মণিদুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। ভিনজ কাঁপা গলায় আবার বলল, ইংরেজটা এবার মিউনিখের দিকে।

ম্যানফ্রেড থমথমে গলায় বলে উঠলো, তুমি ওর সঙ্গে সবকিছু ব্যাপারটা সেরে ফেলেছে। যাই হোক মিউনিখে ঢোকার আগে ওর সঙ্গে যা করবার করে ফেলল।

আমি ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু করেছি। সমস্ত ব্যাপারটা তুমি চেক করলে।

-হ্যাঁ সবসময় আমার সঙ্গে চেক করে নেবে ভিনজ সব সময়ে। এরপর সৌজন্যের খাতিরে মিঃ রেইনহার্ড দিয়েত্রিচকে একবার জানিও।

–আমি এগোবার ব্যাপারটা জানাবো।

ব্যাভেরিয়ার মূল ভূখণ্ডে ফোন বুথের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিনজ বুঝতে পারলো এবারে ফোনের সংযোগ কেটে গেছে। দ্রুত বেরিয়ে এসে অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে মিশে গেল ও।

***

লিনডাউ-এর একটা মধ্যযুগীয় শহর। চারিদিকে কুয়াশায় ঢাকা। পুরোনো শহর, নুড়িবিছানো রাস্তাঘাট। অন্ধকারে গলিগুলো এক ভয়ঙ্কর আকার নেয়।

আইন মেনে চলা লিন্ডাতে কোন বিপদ নেই স্বাভারিক অবস্থায়।

ম্যানফ্রেড ফোন ধরার পরেই তিনটে গাড়ি দ্রুত ব্রীজের ওপর দিয়ে হাউস্টব্যানহফের দিকে ছুটে চললো। অস্ট্রিয়া আর জার্মানীর সীমান্ত এই লিন্ডা স্টেশনটা দেখবার মতো। লিন্ডা থেকে মিউনিকে যাবার পথে কোন সীমান্ত পেরোতে হয়না। কিন্তু সঠিক পাশপোর্ট না থাকলে জেলে যাবার সম্ভাবনা।

ভিনজের নেতৃত্বে আটজন লোক তিনটে গাড়িতে হাউপ্টব্যানহফের দিকে এগিয়ে চলেছে। দুজনের হাতে স্যুটকেস, তাতে ইউনিফর্ম আছে। এদিকে মিউনিখ এক্সপ্রেস লিন্ডা ছেড়ে চলে যাবার পথে।

ওদের পরনে রেলওয়ে টিকিট ইন্সপেক্টর আর জার্মান পাশপোর্ট কন্ট্রোল অফিসিয়ালদে মতো। এদের বিশ্বাস এবং পরিকল্পনা যে পাশপোর্ট ডাবল চেক করলেই মার্টেলকে ধরা যারে আটত্রিশ বছরের ভিনজই এর মূল চার্জে।

ভিনজের পরনে পাশপোর্ট কন্ট্রোলের ইউনিফর্ম। ভিনজের ভাবনায় মাত্র কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যেই নিশ্চয়ই মার্টেলকে ধরা যাবে। নিশ্চয়ই দরজাটা খোলাভি জানে এই ট্রেনগুলে একেবারেই ফাঁকা যায়।ওর কামরায় অন্য কেউ থাকলেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এবার ট্রেন আসবে। ফাঁকা জায়গা দিয়ে আটজন আলাদাভাবে নেমে

এগোলো। ওদের অশরীরীর মতো মনে হচ্ছিল। ঠিক সময়েই এসেছে। আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকী।

***

আঠাশে মে, বৃহস্পতিবার :

–কেইথ তোমার লিনডাউ পছন্দ হবে। ক্লেয়ারের কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে মার্টেল এক্সপ্রেসের জানলার দিকে তাকালো। হফারের কণ্ঠস্বর আবার বলে উঠল, এটা জার্মানীর খুব পুরোনো সুন্দর শহর।

জানি অন্যমনস্কভাবে মার্টেল আবার বলল, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বি. এন. ডি-র এরিখ স্টোলারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ব্যাপারটা ওর একবার দেখার

বলতে বলতে মার্টেল বাক্স থেকে একটা রুমাল বের করে তার মধ্যে থেকে নীলচে রঙের একটা বড় পেনের মতো বস্তু বার করল। ফেসিং-এ একটা বোতাম আর বেসের দিকে আর একটা বোতাম আছে।

এমব্রডারী মিউজিয়ামে লোকটা যখন গুলি খেয়ে পড়ে গেল তখন ওর হাত থেকে ছিটকে পড়া ডেলটার এই খেলনাটা পেয়েছি। এতে একটা সূঁচ আছে আর তাতে বিষমাখানো আছে স্টোলারের ফরেনসিকের লোকেরা বলতে পারবে বিষটা কি?

–ঐ মেয়েটা, যাকে আমি হোটেলের বাইরে গুলি করেছি।

–ওটাও ঐ একই ব্যাপার। দিয়েত্রিচের কাছে ইলেকট্রনিক্স শুদ্ধ আছে। ব্যাপারটা দারুণ...

–ওকি এই জিনিস তৈরী করে নাকি?

–হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বাক্সের মধ্যে মার্টেল ওই সূঁচজাতীয় জিনিসটা ঢুকিয়ে রাখলো।

জানালার দিকে তাকিয়ে সুইজারল্যান্ডের চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল। বাইরে সবুজ ক্ষেত আর পাহাড়, ট্যুরিস্টদের পক্ষে দারুণ।

এবারে দৃশ্যটা বদলাচ্ছে। কোনস্তানজ লেকের ওপরে কুয়াশার ঘন পর্দা। কিছু কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। মার্টেল দৃশ্যটা দেখতে দেখতে হফারকে জিজ্ঞেস করলো, এটাই তো রাইন ডেলটা?

–হু, আমরা নদীটা পেরোচ্ছি। এরপরে এটা লেকে গিয়ে মিশেছে।

ডেলটা লেকের একেবারে পূর্বদিকের শেষপ্রান্তের ভৌগলিক অবস্থানটা বেশ রহস্যময়।

মার্টেল চশমাটা পরে নিয়ে সিগারেট ধরালো। ক্লেয়ার বলে উঠলো, আমরা একটু পরেই লিন্ডাউতে পৌঁছবো। আর আমরা নিশ্চয়ই দেখবো...। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ক্লেয়ার বলে ওঠে, এই জায়গাতেই ওয়ার্নারকে শেষ দেখা গিয়েছিল।

-কিন্তু আমরা অষ্ট্রিয়ার ব্রেজেঞ্জে নামবো। একেবারে শেষ অবধি যাবো না।

—কেন?

-ওখানে নামাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটাই ডেলটার অনুমান করার শেষ জায়গা...।

–হাউপ্টব্যানহফ। মিউনিখ..হাউপ্টব্যানহফজুরিখের... ডেলটা.. সেন্ট্রালহক... ব্রেজেঞ্জে... ওয়াশিংটন, ডিসি...কিলট লুমিস..পুলাখ, বি. এন. ডি...অপারেশান ক্রোকোডাইল।

সবগুলোই ওয়ার্নারের কালো ছোট্ট নোটবুকটায় লেখা ছিল। গোপন পকেটে এটা পাওয়া গেছে। এরিখ স্টোলার নোটবুকটা পেয়ে লন্ডনে টুইডকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ব্রেজেঞ্জ।

এক্সপ্রেসের গতি কিছুটা কমলো। জানলা দিয়ে কোনস্ট্যানজ লেকের ধূসর জলরাশি দেখা চ্ছে। এক্সপ্রেস থামলে মার্টেল সুটকেস হাতে নিয়ে দরজা খুলল। কিন্তু কোন প্লাটফরম নেই। লাফালো। ক্লেয়ারের হাতে স্যুটকেস। ও ক্লেয়ারের কনুই ধরে নামিয়ে রেললাইন পেরিয়ে কটা পুরোন একতলা বাড়ির দিকে এগোতে লাগল।

তুমি ভয় পেয়েছো...?

–কি ঘন কুয়াশা। ক্লেয়ার বলল।

ক্লেয়ারের দেহে রেনকোট থাকা সত্ত্বেও ওর ঠাণ্ডা লাগছে। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসে ময়ার শিউরে উঠলো। এটা ঠিক কুয়াশা নয় এক ধরণের ধূসর রঙের বাষ্প।

ব্রেজেঞ্জের পেছন দিকটা অস্পষ্ট জঙ্গলের মতো দেখাচ্ছে। স্টেশন ওরা পেরোতেই ক্লেয়ারের খে পড়ল কুয়াশার অস্পষ্টতা ভেদ করে একটা পাথরের দেওয়াল। অনেকদূর চলে গেছে। ওরা রিয়ে একটা স্বয়ংক্রিয় ধাতব কামরার মধ্যে নিজেদের লাগেজ জমা করে দিয়ে ব্রজেঞ্জের দিকে গোতে লাগলো।

জায়গাটা একেবারে রবিবারের মতো ফাঁকা। স্টেশনের মুখোমুখি একটা পুরোনো ধাঁচের বাড়ি মুখে মার্টেল দাঁড়িয়ে চারিদিকটা ভাল করে দেখতে লাগল। ক্লেয়ার কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে খেতে লাগল।

চশমাটা পড়ে তোমার ব্যক্তিত্বই পাল্টে গেছে। যাইহোক আমরা এখানে কিজন্যে এসেছি?

মার্টেল টুইডের দেওয়া দুখানা ফটো বের করে একটা ক্লেয়ারের হাতে দিল। ক্লেয়ার দেখল এই সেই নিহত লোক যার সঙ্গে ও ছমাসেরও বেশী কাজ করেছে আর যে জায়গায় ও দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে সামান্য দূরে ও নৃশংসভাবে খুন হয়েছে।

–আমরা এখন ওয়ার্নারের খোঁজ করছি। মার্টেল ওকে বলল, ওর স্ত্রী বোধহয় এখানেই কোথাও আছে, আর উনি খুব অসুস্থ। আমরা একটা ম্যাপ কিনে জায়গাগুলোকে কটা ভাগে ভাগ করে দুঘণ্টার মধ্যে...।

ব্যাপারটা কাজের কাজ হবে। কথার মাঝখানেই ক্লেয়ার বলে উঠলো।

ওয়ার্নার যে এখানে ছিল সেটা ওর নোটবইতে আছে। লোকটার একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। যাই হোক আমরা ঠিক করে নেবো কোন্ জেলায় আমরা প্রত্যেকে যাবো।

***

মিউনিখের অ্যাপার্টমেন্টে গ্লাভস পরা হাতটা ফোনের রিসিভারটা তুলল। ম্যানফ্রেড যাকে ভাবছিল সেই এরউইন ভিনজ-ই ফোন করেছে।

–আমি মিউনিখের হাউনহফ থেকে বলছি।

ভিনজ নিজের কোড নাম্বার দিয়ে পরিচয় দিল আর বললো, কয়েক মিনিট আগে ট্রেন নড়েছে।

ভিনজ কেমন যেন আমতা আমতা করছে বলে ম্যানফ্রেড ভাবলো পুরো ব্যাপারটায় হয়ত দু গণ্ডগোল হয়েছে। ম্যানফ্রেড ওকে আসল ঘটনা জানাতে বলল।

চমৎকার! ভালই হয়েছে, চালিয়ে যাও।

–ইংরেজটা ট্রেনে ছিলনা। সম্ভবতঃ ও আগেই হয় রোম্যানর্শন নয় সেন্ট মারগারেখেন-এ থেমে গেছে। সুইজারল্যান্ডেই নেমেছে। সেন্ট গ্যালেনের এক্সপ্রেসে কোলহার ওকে দরজা বন্ধ হতে দেখেছে।

ম্যানফ্রেডের কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু জটিল। মনের ভেতরটা বাইরে থেকে বোঝা দায়। ভিনজ এখন নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারটা অসহ্য! কিছুতেই মানতে পারছেনা ম্যানফ্রেড।

ও বললো, যদি ট্রেনটা সুইজারল্যান্ড দিয়ে বরাবর যেতো তাহলে কোলহার জানতে পারত...।

ম্যানফ্রেড আবার বলল, সুইস বর্ডার থেকে তোমার কাজ শুরু। লিন্ডাউতে তুমি ট্রেনে আছো...।

বদমাইসটা ব্রেজেঞ্জেই নেমেছে। কারণ জায়গাটা একেবারে খোলামেলা। বলতে গিয়ে ভিনজ-এর গলা কাঁপছিল।

বেজেঞ্জের নামটা চিবিয়ে বলতে বলতে ম্যানফ্রেড সজোরে রিসিভারটা চেপে ধরলো ম্যানফ্রেড একেবারেই চায়নি মার্টেল এই শহরটায় ঢুকুক। ওর গলা ফাটিয়ে চকার করতে ইচে করলেও ভিনজের কাছে প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখলো।

–যাইহোক, আর্মি ব্রেজেঞ্জে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা টীম পাঠাচ্ছি। ভিনজের এই কথা অপরপ্রান্ত থেকে কোন সাড়া এলো না।

খানিক বাদে ম্যানফ্রেড বলল, তোমার টীম আধঘণ্টার মধ্যেই যোগাযোগ করুক এটাই চাই ব্যাপারটাতে তোমাকে সফল হতেই হবে।

ওর এই কথায় ভিনজ কেঁপে উঠল। এটাই তাহলে ম্যানফ্রেডের সতর্কবাণী। যেমন করে হোক ইংরেজটাকে খতম করতেই হবে।

***

সেন্ট গ্যালেন থেকে মার্টেলের ফোন পাওয়ামাত্র টুইড অফিস থেকে ফ্ল্যাটের দিকে নজ দিলো। কিন্তু হাওয়ার্ডের নতুন সহকারী ম্যাসন ওকে খানিকটা দেরী করে দিয়েছিল। অবশ্য টুই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

-স্যার চীফ আপনাকে একবার অফিসের দিকে ডাকছে। খুবই জরুরী দরকার।

জরুরী কি সবসময়েই। ঠিক আছে। ফিরে এসে দেখা করবো।

টুইড ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে একটা ক্যাব নিলো.এবং সঙ্গে সহকারিণী মিস ম্যাকনেইলকেও নিল ওর হাতে ধরা হোল্ডেলে মার্টেলের টেপটা লুকোনো। ক্যাবের মধ্যেই ও একবার জিজ্ঞেস করলে ম্যাসনকে নতুন নেওয়া হয়েছে। লোকটা কেমন?

-দেহরক্ষী হিসাবে ভাল। ম্যাকনেইল স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, ও জুডো, ক্যারাটে এসবে দক্ষ হাতবন্দুকও ভাল চালাতে পারে। হাওয়ার্ড ওকে নিতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ ভীষণ খুশী।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে ম্যাকনেইল মার্টেলের কথাবার্তার টেপটা চালিয়ে দিল আর মাঝে মাঝে নো নিতে লাগলো। টুইডকে চা খাবার খেতে বলল। টুইড নিজের ব্যস্ততার জন্যে তা প্রত্যাখ্যান করল

এই ফ্ল্যাটে টুইড একাই থাকে। নিজেই সব কিছু করে নেয়, তবে একটা দেহাতী সিসিলিয়া আছে কাজকর্ম করে দেয়। টুইড নীচের রেস্তোরাঁ থেকে চাআনালো। চা খেতে খেতে প্রশ্ন করলে মার্টেলের তথ্যগুলোতে বিশেষ কিছু আছে?

-হ্যাঁ দুটো জিনিস আছে। প্রথমতঃ ডেলটাদের সংগঠনটা উন্মাদ আর রক্তপিশাচ বলে মনে হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ ডেলটা নয়া নাজীদের ব্যাপারে কিছু একটা মিথ্যে বা মেকি। আমি ঠিক বুঝতে...

ম্যাকনেইল তুমি সত্যিই সুন্দর। আমি নিশ্চিত যে, দোসরা জুনই হচ্ছে একেবারে শেষ দেখা। যেদিন সামিট এক্সপ্রেস প্যারিস ছাড়লো। কারণ সকালেই এটা ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করছে।

তুমি কি ব্যাভেরিয়াতে নির্বাচনের কথা ভাবছো?

নিশ্চয়ই। তিনটে প্রধান দল ক্ষমতার জন্যে লড়ছে, কে রাজ্যের সরকার গড়বে। দিয়েত্রিচে ডেলটা, নয়া নাজী, চ্যান্সেলার ল্যাংগার-এর সরকারী দল এবং বামপন্থীরা যাদের সঙ্গে প্রাক্তন কম্যুনিস্টরা আছে। যদি তেসরা জুন অর্থাৎ নির্বাচনের আগের দিন নাটকীয় কিছু ঘটে, তাহলে নির্বাচনের ফল টফলারের হাতে চলে যাবে অর্থাৎ বামদের দখলে। থেমে আবার বলল, তার মানে পশ্চিমে একটা বিপর্যয়।

–কি নাটকীয় ঘটনা?

চায়ে চুমুক দিয়ে টুইড বললো, আমি স্থির নিশ্চিত যে, ডেলটার একটা গোপন–পরিকল্পনা আছে।

–আর ঐ মিথ্যে?

ম্যাকনেইল চুপ করে বসেছিল। টুইড চশমার ফাঁক দিয়ে ওকে একবার দেখলো। তারপর খুব আস্তে বলে উঠলো, ডেলটার মধ্যে একটা আলাদা গ্রুপ গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কার্যকলাপই এখন বলে দিচ্ছে যে, তারা নির্বাচনে হারবে।

–হুঁ। ম্যাকনেইলের ছোট্ট জবাব।

***

–তোমরা দুজন কোথায় ছিলে?

ম্যাকনেইল আর টুইডকে দেখে হাওয়ার্ড বলে উঠলো ও অফিসেই ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। হাওয়ার্ডের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠছিল। পেটের ওপর দিয়ে ও একবার হাতদুটো জোড়া করলো। ওখানে একটা সোনার ঘড়ির চেন রয়েছে। টুইড ওকে খুব ভাল করেই লক্ষ্য করলো। বেশ হাসি খুশী স্বভাবের।

–এই একটু রিজেন্টপার্কে গিয়েছিলাম। এমনিই...। টুইড ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল।

হাওয়ার্ড বলল, তোমরা একটা সমস্যার মধ্যেই কাজ করছো না?

ম্যাকনেইলের মনে হল এস. আই. এস-এর প্রধান কেমন যেন নার্ভাস। ওর হোল্ডেলটা এখন ফাঁকা। টেপটা ফ্ল্যাটে রেখে এসেছে।

হোল্ডেলের ভিতর কি আছে হাওয়ার্ড জানতে চাওয়াতে ও জবাব দিলো, এই বিশেষ কিছু নয়। স্যান্ডউইচ, চীজ এসব।

বলে ও বাইরের দিকে এগিয়ে গেল।

হাওয়ার্ড এবার বলে উঠল, তুমি কি কেইথ মার্টেলের ব্যাপারে কিছু শুনেছো? প্রশ্নটা টুইডের উদ্দেশ্যে।

–আমি তো ভেবেছিলাম ভিয়েনার সামিট কনফারেন্সে তুমি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। তাহলে মার্টেলের ব্যাপারে আর আগ্রহ কেন?

–হুঁ, এ তো প্রতিটা লোককেই করতে হবে।

তবে আমাকে একটা কথা বলল। তুমি যদি ব্যাপারটা রেকর্ড রাখতে চাও, তাহলে আমাকে একটা মিনিট পাঠিয়ে দাও। ওটা মন্ত্রীকে দেখাবো।

টুইড চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে দিয়ে হাওয়ার্ডের দিকে তাকালো। বললো, যাইহোক আমার মনে হয় সাধারণ লোক কি আমেরিকা, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট কিংবা জার্মানীর চ্যান্সেলারের নিরাপত্তার ভার নিতে পারবে?

–টিম ও'মিয়েরা ওয়াশিংটনে আছে। অ্যালিন ফ্রাসে প্যারিসে আর এরিখ স্টোলার বনে। এগুলো কি সত্যিই তোমার...?

না, আমি আশ্চর্য হচ্ছি আমার পুরোনো বন্ধুরা সবাই কাজে ব্যস্ত। টুইড ওর চীফের দিকে তাকালো। এরপরই হাওয়ার্ড গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ম্যাকনেইল একবার দরজার দিকে তাকালো।

–ও বেরিয়ে গেছে?

–হ্যাঁ, বৃটিশ সিংহ গর্জন করছে। এখন অবশ্য নিরাপদ।

এরপরে দ্য টাইমস অ্যাটলাসের কপিটা খুললো। তারপর বলে উঠল, ক্রোকোডাইল–এই কোডটার গন্ধ যেন আমার নাকেই লাগছে।

***

এরউইন ভিনজ ওর একজিকিউশান স্কোয়াড-কে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ব্রেজেঞ্জের দিকে রওনা হলো। আটজন তোক বিমান থেকে নেমেই তিনটে গাড়িতে তাড়াতাড়ি সীমান্ত দিয়ে এগিয়ে চললো।

তিনটে নাগাদ ওরা স্টেশনের মুখোমুখি এসে হাজির হলো।

–আমার ধারণা মার্টেল এখানেই ট্রেন থেকে নেমেছে। ভিনজ গাড়ির ভেতরের দুজনকে বলল। চারিদিক তাকিয়ে আবার বললো, ও এখনও মনে হয় ব্রেজেঞ্জেই আছে। তোমরা এখানেই থাকো, আমরা বাকী কজন শহরটা একবার চক্কর মেরে আসি যতক্ষণ না ওকে খুঁজে পাই।

আমরা যদি ওকে ট্রেনে দেখতে পাই? একজন ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

তাহলে ওর কপালে নির্ঘাত দুর্ঘটনা আছে। যাইহোক ও এখনো মিউনিকে পৌঁছায়নি। ভিনজ বলল।

এরপরে ভিনজ অন্য পাঁচজনের সঙ্গে খানিকটা পরামর্শ করলো। বললো, মার্টেলকে কেউ ধরতে পারলে বিশ হাজার ডয়েটমার্ক তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। জনসাধারণকে বলবে একটা পাগলাটে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। বিপজ্জনক। এখন থেকে দু-ঘণ্টা পরে আমরা আবার এখানেই মিলিত হবো। কেমন?

***

মার্টেল চার্লস ওয়ার্নারের পদচিহ্নসংগ্রহকরলো বলা যেতে পারে। কেইসারট্রোসেতে একজন মাঝবয়সী বই বিক্রেতার সঙ্গে রাস্তায় ক্লেয়ারও মার্টেলের সঙ্গে আধ ঘণ্টার জন্য সাক্ষাঙ্কারের ব্যবস্থা করা হল। ওয়ার্নারের ফটো বই বিক্রেতাকে দেখাতেই ওর মুখে প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠল।

বিক্রেতা বলল, আমি তোমার বন্ধুকে চিনি। গ্রিফ সম্ভবতঃ ওর সঙ্গী ছিল।

–গ্রিফ? মার্টেল সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করল।

-হ্যাঁ, ওর প্রিয় বন্ধু। এখানে বেড়াতে এসেছিল আর তখনই মারা যায়। ঘটনাটা ঘটেছিল ভোরালবার্গ আর টাইরস ফরাসী মিলিটারীআসার সময়। যুদ্ধের পর ওর বন্ধুকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয় আর এতেই ওর মনে হয়েছিল বন্ধুকে যথোচিত সম্মান দেখানো হয়েছে।

-আচ্ছা...।

মার্টেল সতর্ক। লোকটা আবার বলতে লাগলো, এই ব্রেজেঞ্জে দুটো ক্যাথলিকদের, একটা প্রোটেস্ট্যান্টদের সমাধিস্থল আছে। ওর বন্ধুটার আবার বিচিত্র ব্যাপার। জন্মেছিল প্রোটেস্টান্ট হয়ে। পরে হল ক্যাথলিক। আরো পরে কোন বিশ্বাসই ছিল না। আমার কাছে এসে তিনটে সমাধিস্থলই কোথায় জানতে চেয়েছিল। আমি ওকে স্ট্রীটের একটা ম্যাপে ওগুলো দেখিয়েছিলাম।

কতদিন আগে?

প্রায় সপ্তাহখানেক আগে। গত শনিবার।

–আমি একটা ওরকম ম্যাপ কিনবো।

বই বিক্রেতা একটা ম্যাপ খুলে ওকে তিনটে সমাধিস্থল বুঝিয়ে দিল।

***

ক্লেয়ার মার্টেলের জন্য সাবওয়ের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েছিল। ক্লেয়ার মনোযোগ দিয়ে সামনের একটা প্রাচীন দেওয়ালের জানালার ধ্বংসাবশেষ নিরীক্ষণ করছিল।

হঠাৎ মার্টেল ওর মনোযোগ ভঙ্গ করে বলে উঠল, গত শনিবার আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, এখান থেকে একশো ফুটেরও কম দূরত্বে ও দাঁড়িয়েছিল।

শনিবার ছিল। তারপরই লেকে খুন হয়। দিনটা রবিবার।

–আচ্ছা কতদিন আগে অস্ট্রিয়াতে মিলিটারী ঢুকেছিল?

অস্ট্রিয়ার ব্যাপারটা শেষ হয়েছিল মে মাসের পনেরো তারিখে। সাল ১৯৫৫। কিন্তু ওয়ার্নার...।

ব্যাপারটা তত অর্ধশতাব্দীর। তাহলে আজকে সেইরকম কিভাবে ঘটতে পারে?

–আমাদেরকে সব কিছুই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক।

–কিন্তু কোথা থেকে আমরা আরম্ভ করব?

-ওয়ার্নার যে তিনটে সমাধিস্থল দর্শন করেছিল, আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করে ঐ তিনটে সমাধিই দেখবো। আশা করি এগুলোর একটার মধ্যে কোনো গোপনতা...।

এদিকে কেইসারস্ট্রাচেতে সেই বইয়ের দোকানে এরউইন ভিনজ এসে হাজির হল। ব্রেজেঞ্জেতে ও দেরী করে পৌঁছনোয় মার্টেল সুবিধে পেয়ে গেছে। ও ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল।

এক তলাতে ভিনজের সঙ্গে বিক্রেতার কথাবার্তা হল। বিক্রেতা মন দিয়ে সব শুনলো।

তারপর বিক্রেতা বলল, তুমি বলছ লোকটা উন্মাদ আশ্রম থেকে পালিয়ে এসেছে?

কথাটা বলে অস্ট্রিয়ানটা ভিনজের দিকে ঐ কুঁচকে তাকালো।

-হ্যাঁ, এমনিতে দেখলে স্বাভাবিক বলেই মনে হবে, কিন্তু আসলে ও একটা ভয়ঙ্কর রকমের উন্মাদ। আর এটাই আরো বিপজ্জনক। দেখেছো নাকি লোকটাকে?

***

৩. সমাধির মূল ফলক

বৃহস্পতিবার আঠাশে মে :

অ্যালিয়িস স্টোচর (১৯৩০-১৯৫৩)

ঈশ্বরকে আমরা বিশ্বাস করি...।

ব্লুমেন স্ট্রাচের সমাধির মূল ফলকটার দিকে মার্টেল, ক্লেয়ার আর একটা বুড়ো তাকিয়েছিল। মার্টেল ভাবল এই অ্যালিয়িস লোকটা আবার কে? বুড়োটাকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল এই লোকটা কি এখানে কবর দেখতে এসেছিল?

বুড়ো মার্টেলের কথায় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো। তাহলে বই বিক্রেতা আর বুড়োটা একই কথা বলছে। দিন জিজ্ঞেস করাতেও বলল শনিবার, বই বিক্রেতাও ঐ একই কথা বলেছে। কিন্তু ওয়ার্নারের সঙ্গে অ্যালিয়িসের সম্পর্ক কিরকম ছিল? অ্যালিয়িসের মৃত্যুর সময়টা জানা গেল ফরাসী অধিকারের শেষের দিকে।

ক্লেয়ার এতক্ষণ চুপচাপই ছিল। হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করল, আর কে এসেছিল ওর সঙ্গে? লোকটা চুপ করে থাকাতে ক্লেয়ার ওকে অর্থের লোভ দেখিয়ে বলল খোলাখুলি সব কিছু জানালে ওর উপকারই হবে।

তখন লোকটা বলল বেশ খানিক পর, একজন মহিলা এখানে এসেছিল এবং তাকে ও চেনে না, তবে ও প্রতি সপ্তাহে বুধবার আটটা নাগাদ ঘোড়ার গাড়িতে করে এসে কবরে ফুল দিয়ে আবার ঐ গাড়িতেই ফিরে যায়।

এরপরে ওরা মহিলাটির পুঙ্খনাপুঙ্খ বিবরণ জেনে নিলো। এবং লোকটা যেন দ্রুত কুয়াশার সঙ্গে মিশে গেল।

–তুমি কি লোকটাকে দেখেছো?

মার্টেলের সঙ্গে যে বই বিক্রেতা কথা বলেছিল সেই আবার এডুইন ভিনজ-এর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল। তারপর অস্বীকার করল। এডুইন তাকে পুলিশের লোক নয় বলে অভয় দিলেও লোকটা একই কথা বলল যে, ওরকম কোন লোক তার দোকানে কোনদিন আসেনি। অগত্যা বিফল হয়ে ভিনজ গাড়ি নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হলো। বিক্রেটি অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল আর ভাবল একটু আগে যে লোকটা তার দোকানে এসেছিল, ও তাকে খুঁজছে। কিন্তু বিক্রেতা লোকটির সতর্ক চোখ দেখে ফেলেছে, ওর কোটের পকেটে ব্যাজ আছে। বুঝল নয়াজীর লোক। এবার যদি আসে পুলিশ ডাকা ছাড়া কোন উপায় নেই।

***

সুন্দর বিকেল। ভিনজ রেল স্টেশনে দুজনকে ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে বলল। বাকীরা সবাই গাড়িতে করে খুঁজবে। ভিনজের লোকেরা সমস্ত হোটেলে হানা দিয়েছে, কোন

খোঁজ মেলেনি। এদিকে ভিনজের দুজন লোক সতর্ক দৃষ্টিতে গ্যালাসট্রাসেতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। ওদিক থেকে মার্টেল, ক্লেয়ারও সাবধানে গাড়িতে এগোচ্ছিল।

ঠিক স্টেশনের সামনেটায় এসে মার্টেল গাড়ি নিয়ে নিচে নেমে গেল। হঠাৎ ক্লেয়ারের পেছনের দিকে লক্ষ্য পড়তে বলে উঠল, কেইথ, আমাদের ঠিক পেছনেই বি. এম. ডবলু। একজনের পকেটে ডেলটা ব্যাজ দেখছি।

মার্টেল মাথা না ঘুরিয়েই ফিসফিসিয়ে বলল, শোন স্পীড বাড়িও না বা ওদের দিকে তাকিও না। কোনরকম পরিবর্তন যেন ওদের চোখে না পড়ে।

ভিনজ ওর স্কোয়াডের প্রতিটা লোককে মার্টেলের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে রেখেছে। সুতরাং ওকে চিনতে কারোর কোন অসুবিধা হবে না। বি. এম. ডবলুর সামনের লোকটার হাতে রিভালবার।

এখন এই জায়গাটা খুবই শান্ত। ক্লেয়ার খুব সন্তর্পণে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে যাচ্ছে। কোলের ওপর ম্যাপ নিয়ে মার্টেল মনযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে ক্লেয়ারকে বলল, ঘাবড়াবার কিছু নেই। ইতিমধ্যে পাশ দিয়ে স্কোয়াডের লোকেদের গাড়িটা ওদের অতিক্রম করে গেল। মনে হল ওরা কোনরকমভাবে টের পায়নি। মার্টেল ক্লেয়ারকে বলল গাড়িটা যেন কোন মতেই লেক বা স্টেশনের সামনে না যায়। মার্টেল ভাবতে লাগলো বি. এম. ডবলুর লোকেরা কিভাবে এখানে চলে এল এবং ওরাই যে ডেলটা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই রইল না।

ম্যাপটা কোলের ওপর থেকে তুলতেই ক্লেয়ার দেখল যে মার্টেলের কোলের ওপর ম্যাপের নীচে ৪৫ কোল্ট রিভলভারটা রাখা আছে।

মার্টেল মৃদু হেসে ক্লেয়ারকে বলল, ওরা টের পাওয়া মাত্রই আমি ওদের দুজনের খুলি উড়িয়ে দিতাম।

মার্টেলের মাথায় লম্বা টুপি, দাঁতের মধ্যে চেপে ধরা সিগার পাইপ, চোখে চশুমা এসব পড়ে ওকে বেশ অদ্ভুতই দেখাচ্ছিল। অন্য সময় এরকম দেখায় না।

যাইহোক, এবার ওরা সীমান্তের দিকে এগোতে লাগলো। এখন ওদের গন্তব্যস্থল লিন্ডাউ।

***

বিকেল পেরিয়ে গেছে, ব্রেজেঞ্জ থেকে ভিনজ দিয়েত্রিচকে ফোন করলো। সারা শরীরে ক্লান্তি, অবসন্নতা।

ভিনজ ম্যানফ্রেড লোকটাকে এত ভয় পায় যে কোনমতে এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। ওদিক থেকে ফোনে দিয়েত্রিচের গলা ভেসে এলো।

সমস্ত ব্যাপার ভিনজ রিপোর্ট করে জানালো যে, কাজটা খুবই শক্ত। সম্ভবতঃ ইংরেজটা এখানে নেই।

দিয়েত্রিচ কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠল। বলল, হতেই পারে না, ওখানেই আছে। ব্রেজেঞ্জ ছোট্ট শহর, ভাল করে খোঁজ।

ভিনজ জানালো, শহরটা খুব একটা ছোট্ট নয়। তার ওপর সারা শহরটা কুয়াশায় ঢাকা, কাছের লোককেও চেনা যাচ্ছে না।

আরও কিছু কথাবার্তার পর ভিনজ ফোন ছাড়লো। সারাদিন কিছু খেতেও সময় পায়নি, খিদেতে পেট জ্বলে যাচ্ছে, ওদিকে দিয়েত্রিচ ওদের সবাইকে গালিগালাজ করে ফিরে আসতে বলেছে।

ভিনজ ভাবল ওয়ার্নারের থেকেও গুপ্তচর হিসেবে মার্টেল আরও বেশী সুচতুর। কিন্তু ধরা ওকে আমার হাতে পড়তেই হবে, ভুল ওকে করতেই হবে। ছদিনের মাথায় সামিট এক্সপ্রেস ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করবে। আর সেদিনই মার্টেল ধরা পড়বেই...পড়বে...।

দিয়েত্রিচের এস্টেটের দেওয়ালের বাইরের ঠিক সামনেটায় ছোট একটা জঙ্গল আছে। এস্টেটে ঢোকার মুখে লোহার গেট।

গেটের ভেতর একটা জার্মান শেফার্ড কুকুরকে দেখা গেল মাঝে মাঝেই চীৎকার করছে। যেন অচেনা কাউকে দেখলেই ছিঁড়ে খাবে, টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

দূরের একটা গাছের নীচে একটা মার্সিডিস দাঁড়িয়ে আছে যার মালিক বি. এন. ডি-র চীফ এরিখ স্টোলার। তেতাল্লিশ বছরের লম্বা এরিখের অনুভব ক্ষমতা প্রচণ্ড রকমের তীক্ষ্ণ।

ওর পাশে বসে ওর চীফ অ্যাসিস্ট্যান্ট অটো ওয়াইল্ড। হাতে ছোট আকারের, টেলিলেন্স লাগানো একটা সিনে ক্যামেরা, কুকুরটার চেঁচানিতে ভয় পেয়ে চীফের দিকে তাকালে স্টোলার নির্বিকার চিত্তে গ্যাস পিস্তলটা বের করে ওর হাতে দিয়ে মৃদু হেসে বলল, তেমন দেখলে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়বে। কুত্তাটার নাকে লাগলেই...।

–ওরা তো জানে আমরা এখানে, ওদের উচিত আমাদেরকে...।

–বোকার মত কথা বোলনা।

ওরা দিয়েত্রিচের লোহার গেটটার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর ওদের চোখে পড়ল তিনটে গাড়ি আসছে, যার প্রথমটায় এডুইন ভিনজ। সমস্ত ব্যাপারটা অটোর ক্যামেরায় উঠে যাচ্ছে।

স্টোলার এই জায়গায় প্রথম এলো। বোঝা যাচ্ছে ভিনজ মার্টেলের সাক্ষাৎ পায়নি। স্টোলার সর্ব শক্তি দিয়ে ডেলটার মূল বস-কে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ডেলটার হেডকোয়ার্টার এখানে কোথায় আছে?

–এরকম কেন মনে হল? অটো স্টোলারের প্রশ্নের জবাবে বলে উঠল।

কারণটা আর কিছুই নয়। রেইহার্ড দিয়েত্রিচ তত ব্যাভেরিয়ার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে নির্বাচনে দাঁড়াবে। এই যে এস্টেট–এটা একটা বিরাট...।

–আমি তো তোমাকে ম্যাপ দেখিয়েছি।

এরপর কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা দেখল সে গেট খুলছে।

স্টোলার গাড়িটা চালিয়ে এবারে সামনের দিকে এগোলো। কুকুরটা রাস্তায় বেরিয়ে এসে একটা অচিহ্নিত পুলিশের গাড়ির পিছু নিল। স্টোলারের গাড়ির সামনে এসে একটা কুকুর জানলাতে আঁচড়াতে লাগল। এদিকে গাড়িতে করে অন্য দুটো কুকুর ওদের অনুসরণ করছে।

দিয়েত্রিচের ব্যাপারটা কেমন যেন মনে হল। কুকুর গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে স্টোলার অটোকে বলল, দেখেছো কুকুরগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে ঐ–মানে উইন্ডসাফার।

যাইহোক ওরা সতর্কভাবে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। ব্যাভেরিয়ার সবচেয়ে দ্রুত ড্রাইভার স্টোলারকে বলা চলে। ও এবার বলে উঠল, গ্যাস পিস্তলের দরকার হতে পারে। আমি রাস্তাটা বন্ধ করে দেবো।

স্টোলার সামনে একটা ফার্ম দেখে ব্রেক কষে দ্রুত পেছোতে লাগল। ওর উদ্দেশ্য গাড়িটা দিয়ে জায়গাটা আটকে রাখা। গ্যাস পিস্তলটা ওয়াইল্ডের হাতে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে একটা গাছের গুঁড়ির পাশে আত্মগোপন করল।

ওয়ার্নার হেগেনের গাড়িটা কাছাকাছি এল, সঙ্গে আরো দুজন। হেগেন একটা খালি মার্সিডিস দেখে গাড়িটা থামিয়ে দুজনকে অপেক্ষা করতে বলে ও বন্দুক নিয়ে এগিয়ে গেল।

দরজাটা খুলে সতর্কভাবে ভেতরে তাকালো হেগেন। পেছনের লোকটা তখন জানলা দিয়ে কি ঘটছে দেখছিল। স্টোলার গাছের গুঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। হাতে গ্যাস পিস্তল তাক করা। হঠাৎ ড্রাইভারের সীটের কাছে একটা মিসাইল সশব্দে ফাটলো। হেগেনের হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গেল। চারিদিকে ধোঁয়ায় কেউই কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

স্টোলার এরপরে আবার তৈরী হয়ে নিল। দ্বিতীয় মিসাইলটা জানলা দিয়ে ঢুকে একেবারে গাড়ির ভেতর ফাটলো।

স্টোলার নিজের সীটে ফিরে এল।

দ্রুত গাড়ি চালিয়ে অদৃশ্য হল আর কোন গাড়িই ওকে অনুসরণ করছিল না।

ওয়াইল্ড বলল, কি ব্যাপার?

–আমি মার্টেলের কথা চিন্তা করছি, টুইড আমাকে বলেছে যে ও ফিরে আসছে।

–ওয়ার্নারের মতো? সহযোগিতা করছে না?

-আরে না, ঠিক তার উল্টোটাই, প্রয়োজন বোধ করলেই ও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তবে আমি ভাবছি, ঠিক এই মুহূর্তে ও এখন কোথায় আছে?

***

বৃহস্পতিবার, আঠাশে মেঃ

মার্টেল একটা গাড়ি ভাড়া করে ব্যাভেরিয়ার মূল এলাকা ধরে ছুটে চলেছে লিন্ডা দ্বীপের উদ্দেশ্যে।

এখন ওর আর ছদ্মবেশ নেই। মাথায় টুপী নেই। হোল্ডারের সিগারেটে টান দিতে দিতে ভাবছে লিন্ডাউ-এ নিশ্চয় ওর ওপরে কেউ নজর রেখেছে।

–ক্লেয়ার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, কি করছ ভেবে দেখছ তো? জার্মানীর সীমান্ত সবেমাত্র ওরা অতিক্রম করেছে।

মার্টেল বলল, বৃটিশ ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে, ইউনিয়ন জ্যাক থাকলে আমার সুবিধা হতো।

–ডেলটার নজরে আমরা পড়ে যেতে পারি।

ক্লেয়ারের কথায় মার্টেল জবাব দিল, মনে হয় তাড়াতাড়িই পড়বো।

–তুমি নিজে থেকেই ওদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে তাই না? পাগল-টাগল হয়ে গেছো বোধহয়, তুমি কি জুরিখ, সেন্ট গ্যালেনের কথা ভুলে গেছো? ক্লেয়ার একটু জোর দিয়েই কথাটা বলল।

–আমাকে ওদের তো মনে আছে। আর একটা কথা, আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কাজটা করতে হবে। তুমি বলেছিলে না বেয়ারিশচার হোটেল এই দ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে ভাল?

–হ্যাঁ। এরপরে হাউপ্টব্যানহফ...।

আমরা ট্রেনেই পৌঁছবো, কিন্তু হোটেলে আমরা আলাদাভাবে নাম রেজিস্ট্রি করবো। আলাদা থাকব, আলাদা খাবো, যেন কেউ কাউকে চিনি না। এরকম ভাবেই তুমি আমাকে গার্ড দিতে পারবে। আর তুমি ওখানে সবসময় তোমার কালো চশমাটা পড়ে থাকবে। ওটায় তোমায় অন্যরকম দেখাবে।

ওরা গাড়িতে করে লেকের কিনারায় এসে পৌঁছলো।

কুয়াশা সরে গিয়ে সূর্য উঁকি মারছে, ক্লেয়ার ম্যাপটা একবার দেখে নিল। কিছুদূরে বিরাট হোটেল।

ওরা এখান থেকে ছাড়াছাড়ি হবার সিদ্ধান্ত নিল। ট্যুরিস্টদের একটা জায়গায় ওরা গোপনে দেখা করার ব্যাপারটা ঠিক করলো।

এরপর ওরা দুজন আলাদা হয়ে গেল। রাস্তার একধারে এক শিল্পী বসেছিল, তার নাম ব্রাউন।

মার্টেলকে চিনতে পেরে পেছনে অনুসরণ করলো ওর গাড়িটা।

***

ব্রাউন আজকে ভেরোনার অ্যাম্ফিথিয়েটারের ছবি এঁকেছিল। সামনের ছোট একটা কার্ডবোর্ড বাক্স, তাতে পয়সা রয়েছে। আসল কাজ হল হাউস্টব্যানহফের সামনের দরজায় নজর রাখা। মার্টেলও ওকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। সুইজারল্যান্ড থেকে মেন লাইনে এক্সপ্রেস আসতে তখনও বাকী।

শিল্পী ব্রাউন ওকে দেখে প্রথমে থতমত খেয়ে তারপর ভাবল, ঠিক আছে।

গাড়ি দুটো পাশাপাশি চলছিল।

মার্টেল এবার বলে উঠল, কি ব্যাপার বলো তো? বড্ড কৌতূহলী।

মার্টেলের রিভালভারও তখন প্রস্তুত।কাঁচের আয়নায় ও ব্রাউনের কাজকর্ম লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

বেশ খানিক পরে গাড়ি থেকে নেমে মার্টেল হোটেলের মধ্যে ঢুকে গেল। মার্টেল কাউন্টারের মেয়েটার কাছে লেকের দিকে ডাবল বেড চাইল এবং সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল।

মার্টেল নির্দিষ্ট ফরমে, পেশার জায়গায় কনসালট্যান্ট–বলে লিখলো। এরপরে ওপরে উঠে বারান্দায় উঁকি মারতে দেখল স্টেশন থেকে ক্লেয়ার বেরিয়ে আসছে।

অদ্ভুত জমকালো পোষাকে ক্লেয়ারকে দারুণ দেখাচ্ছে। সেই শিল্পী ওকে দেখতে পাবেনা। হাউপ্টব্যানহফে ক্লেয়ার সামান্য অপেক্ষা করে একজনকে জার্মানভাষায় হোটেলটা কোথায় জিজ্ঞেস করল। লোকটার সঙ্গে স্ত্রী ছিল।

সে জায়গাটা দেখিয়ে দিল। এদিকে মার্টেল নিজের কাজ ঠিকঠাক করে যাচ্ছে।

ব্রাউন মার্টেলের গাড়ির নাম্বারটা টুকতেই ব্যস্ত।

–এই যে হারামজাদা কি হচ্ছে? মার্টেল ওকে লক্ষ্য করে বলে উঠল। কাপড়ে মোড়া ছোট্ট একটা যন্ত্র নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। একেবারে নীচে এসে লক্ষ্য করলো ক্লেয়ারের সবকিছু করা হয়ে গেছে। ক্লেয়ার উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে এসে দেখল ব্রাউন রাস্তা পেরোচ্ছে।

মার্টেল পাবলিক বুথের দিকে এগিয়ে গেল। একটা হলঘরে সারি সারি ফোন রাখা আছে। মার্টেলের আগে ব্রাউন ঢুকে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মার্টেল খানিকটা থেমে ডায়ালটা তুললো।

হঠাৎ একটা গোলমাল। মার্টেল একটা বুথে ঢুকে শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে লোকটা চমকে গেল।

মার্টেলের মনে হল ঐ শিল্পী বেশ চালাক-চতুর। মার্টেল ডায়াল করলো কিন্তু অপরপ্রান্ত থেকে ভুল সিগন্যাল আসতে বিরক্ত হয়ে ফোন রেখে দিল। কি ঘটছে এ-ব্যাপারে মার্টেল স্থির নিশ্চিত। পরের বুথে ঢুকলো। লোকটাও নিজের কর্তব্যে অটল।

মার্টেল একহাতে ফোন আর অন্য হাতে একটা যন্ত্র কোমর সমান কাঁচের জানলায় চাপ দিতে ওটা স্থিরভাবে বসে গেল। এরপরে হিয়ারিং এড–ঢুকিয়ে একটা তার এমনভাবে লাগালো যাতে লুকিয়ে রাখা যায়।

শিল্পীটার হাতে তখন মামুলি ক্যালিবার। যাই হোক মার্টেলের যন্ত্রটা যে ভালই কাজ করছিল সেটা বোঝা গেল পরের বুথের সমস্ত কথাবার্তা ও শুনতে পাচ্ছিল। অবশ্য ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর বোঝা যাচ্ছিল না।

শিল্পী বলল, এডগার ব্রাউন কথা বলছি, ক্লারা...।

হঠাৎ পরের বুথে মার্টেলের উপস্থিতিতে লোকটা কথাবার্তার ভারসাম্য হারিয়ে যা পারলে বলে যেতে লাগলো, যেমনঃ জিনিসটা নিরাপদে বৈরিশ্চার হফ হোটেলে কয়েক মিনিট আগে : দিয়ে আসা...।

–ঠিক কোথায়? ক্লারা নিস্পৃহ স্বরে জিজ্ঞেস করল অপর প্রান্তে।

–ঐ হাউপ্ট ব্যানহফ আর হারবারের মুখোমুখি। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা...। আচ্ছা আমি কি ডিউটি করবো?

-হ্যাঁ। তোমার ব্যাপারটা আমি রিপোর্ট...।

–শোনো...।

–ইতিমধ্যে সংযোগ ছিন্ন হল। মার্টেল জিনিপত্রগুলো লুকিয়ে ফেলেছে। ব্রাউনের কণ্ঠস্বর এবার খানিকটা পাল্টে গেছে। মার্টেল এবার স্থির নিশ্চিত যে স্টোলারের ব্যাপারে সে ভালরকম তথ্য পেয়ে গেছে।

**৮

দিয়েত্রিচের হেডকোয়ার্টার থেকে মাইল খানেকের মত দূরত্বে এগাবরাতলা একটা বিল্ডিং। তারই একটা অ্যাপার্টমেন্টেক্লারা সবেমাত্র ফোনটা নামিয়ে রেখেছে। সিগারেট ধরিয়ে নিজের মনেই বললো, ব্রাউনটা যে কি করবে...।

এবারে রেইনহার্ড দিয়েচিকে ফোন করল। ক্লারার সৌন্দর্য দিয়েত্রিচের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। খানিক পরে ও দিয়েত্রিচকে স্কলস-এর নাম্বারে ফোন করলে, ওপ্রান্ত থেকে দিয়েত্রিচের উচ্ছলকণ্ঠস্বর ভেসে এলো। কিছু মামুলি কথা হবার পর ক্লারা বলে উঠল, দ্বিতীয় চুক্তি দেওয়া হয়েছে, আমি শুনেছি। লিন্ডাউ-এর হোটেলে বৈরিশ্চারে...। দিয়েত্রিচ বলল, আজ সন্ধ্যেবেলা ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করবে। জেটে করে একেবারে লিন্ডাউ-এর কাছে এয়ার স্ট্রিপে নামবে। ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে হোটেলে ঘর ঠিক করা থাকবে, ওখানে উঠবে। তোমার সাহায্য প্রয়োজনে লাগতে পারে,বলে দিয়েত্রিচ একটা গাড়ির রেজিস্ট্রেশান নাম্বার দুবার পুনরাবৃত্তি করল, তারপর উভয়েই ফোন রেখে দিলো। কেইথ মার্টেলের ব্যাপারেও ক্লারা দিয়েত্রিচকে অবগত করল।

খানিক পরে ও শোবার ঘরে এসে একেবারে নগ্ন হয়ে আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে ভাবলো, এতেই প্রলোভিত করা যাবে মার্টেলকে আর দিয়েত্রিচের ব্যাপারটা মেনে নিতে আপত্তি নেই। এবারে শুয়ে পড়লে, চোখের সামনে ভাসতে লাগলো নিজের কাজের পরিকল্পনা। একটা ইনজেশানের সূচ। ওটাকেই ধীরে ধীরে...।

***

এদিকে দিয়েত্রিচ সারারাত কাটাবার জন্যে একটা বড় গোছের স্যুটকেশ নিয়ে আসতে বলল, ওর দেওয়ালের মধ্যে খোপে নানারকম আকারের সুটকেশ রয়েছে। ও ইন্টারকমে সদ্য ব্রেজেঞ্জ প্রত্যাগত ভিনজকে ডেকে পাঠালো।

শোন ভিনজ তোমার কাজ একটা মেয়ে করছে। আমি এই মুহূর্তে লিন্ডাউ-এর বৈরিশ্চার হোটেলে যাচ্ছি। ওখানেই মার্টেল সদ্য উঠেছে। তুমি উপযুক্ত লোক সঙ্গে নিয়ে এই হোটেলে চলে এসো।

–আমরা এবার ওকে নিশ্চয়ই পাবো। ভিনজ বলল।

দিয়েত্রিচ তার সৌখিন মার্সিডিসে চড়ে ড্রাইভারকে বলল, ঝড়ের মতো লিন্ডাউ-এর দিকে চলো।

***

লিন্ডাউ-এর হাউপ্টব্যানহফের হোটেল। মার্টেল একটা ফোন বুথের বাইরে খানিকক্ষণ থামল। একটা সিগারেট ধরালো।

ব্রাউন ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। মার্টেল অপেক্ষা করতে লাগল যদি জার্মানটাকে আবার দেখতে পায়। কিন্তু না ব্রাউনকে আর দেখা গেল না।

মার্টেল দ্রুত বাইরে এগিয়ে এলো। ব্রাউনকে এবার দেখা গেল। মার্টেল দ্রুত একটা গাড়িতে উঠে বললো পোস্ট অফিস। তাড়াতাড়ি...।

পোস্ট অপিসে পৌঁছেই ফোনের কাউন্টারে গিয়ে টুইডকে ফোন করল।

টুইডকে পাওয়াও গেল। এরপরে মার্টেল কোড নাম্বারে কাজ এগোতে লাগল। বাক্যগুলো এইরকমঃ

ওয়ার্নারকে ব্রেজেঞ্জে দেখা গেছে–অ্যালিয়িস ষ্টোর-এর সমাধি-১৯৩০-১৯৫৩..ফরাসী অধিকারের সময়..বুধবার সকাল...সুবেশী রমণী...ওয়ার্নার ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল...সমস্ত জায়গাতেই ডেলটা সক্রিয়...ব্রেজেঞ্জের একটা গাড়িতে দুজন লোক...।

টুইড জিগ্যেস করলো, ওরা কি তোমায় দেখেছে? আবার কথা আরম্ভ হলো :

আমরা দেখেছি...এখন লিন্ডাউ-এর হোটেল বৈরিশ্চার..ব্রাউন পেভমেন্ট আর্টিস্ট। ডেলটার লোক...স্টোলার...স্টার্টগার্ট-এর ফোন নাম্বার..ক্লারা...।

হঠাৎ টুইড ওকে থামতে বলে ফোন নামিয়ে রাখলো। রেকর্ডিং মেশিনটা বন্ধ করে দিয়েছে। ম্যাকনেইল। মেয়েটা খুব চটপটে। জীবনে কখনও ট্যাক্সি নেয়নি।

টুইড ওকে বলল, শোন ম্যাকনেইল মার্টেল ভীষণ বিপদে পড়েছে। স্টোলারকে ফোনে তাড়াতাড়ি ডাক। ভীষণ জরুরী।

অকারণে তখন মেঘের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

***

বৃহস্পতিবার, আঠাশে মেঃ

মার্টেল আর ক্লেয়ারের মধ্যে সংকেতের ব্যাপারটা ঠিকঠাক রয়েছে। ওরা দুজনে ডাইনিং রুমে এমনভাবে ঢুকবে যেন কেউ কাউকে চেনেনা।

ক্লেয়ার জানে কেউ ঢুকলে সিগারেট ধরিয়ে সংকেত দিতে হবে। একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক হলে ঢুকলো।

দিয়েত্রিচ হলে ঢুকে বসলো মার্টেলের একেবারে বিপরীত দিকের জানলাটার কাছে। ঢুকেই গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে প্রতিটা টেবিলের প্রত্যেককে দেখতে লাগলো। ও আসার পরই হলের পরিবেশটা পাল্টে গেল। সুসজ্জিতা মহিলারা মিলিওনিয়ার ব্যক্তিটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। মার্টেল ভাবতে লাগল টাকার গ্লামারই সবচাইতে বেশি।

মিনিট দুয়েক বাদে ক্লেয়ার টেবিল ছেড়ে রিসেপশান হলে গেল। মার্টেল লাউঞ্জে একটা আর্মচেয়ারে বসে ম্যাগাজিন দেখতে লাগল। এখন শুধুই প্রতীক্ষা।

আর এক নতুন অতিথি কুলি সঙ্গে নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। ক্লেয়ার কাউন্টারে কেম্পটন-এর ট্রেন কটায় জিজ্ঞেস করার ভান করে জেনে নিল, ঐ যে মেয়েটা এল, মনে হয় চেনা। ওকি থাকবে...?

–সম্ভবতঃ এটাই ওর প্রথম আসা...।

ক্লেয়ার হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে মার্টেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওটা ফেলে দিল। হ্যান্ডব্যাগে পিস্তলটা নিরাপদেই আছে। মার্টেল কাগজটা কুড়িয়ে নিল। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ওরা খানিকক্ষণ ফিসফিস্ করে কথা বলে নিলো।

ক্লেয়ার বলল, ওই যে মেয়েটা এলো ওর নাম ক্লারা। স্টার্টগার্ট থেকে আসছে।

–হ্যায়নারা একে একে জড়ো হচ্ছে। ডাইনিং রুমের লোকটা কুখ্যাত দিয়েছি। তাইতো?

–হ্যাঁ। ওর ছবি আমি কাগজে দেখেছি।

এরপরে ব্যাগের ভেতরে পিস্তলটা এমনভাবে রাখলো যাতে তাড়াতাড়ি বের করা যায়। দুজন লোক রিসেপশানে এসে দাঁড়ালো। ক্লেয়ার চিনত, একজন এরউইন ভিনজ আর ওর সহকারীর গ্রস, সুটকেশ হাতে।

ক্লেয়ার পিস্তলটা বের করে কোলের ওপর কাগজের নীচে লুকিয়ে রাখলো। ব্রেজেঞ্জ গ্যালাস-স্ট্রাসেতে এই গ্রসই ডেলটার গাড়িটা চালাচ্ছিল।

এদিকে দুজনে লাউঞ্জের চারদিকে তাকাতে লাগল। গ্রস একবার মনে হল মার্টেলের দিকে তাকালো, কিন্তু ভিনজের সেদিকে দৃষ্টি নেই।

ওরা রেজিস্ট্রেশান ফরম পূরণ করছিল। ক্লেয়ার দেওয়ালে একটা ছবি দেখার ভান করে ওদের সমস্ত কথাবার্তা শুনতে লাগলো।

ঠিক সেই সময়ে দিয়েত্রিচ করিডরের দিকে এগোচ্ছিল। মুখে বড় সিগারেট লাউঞ্জের ওপর দিয়ে যাবার সময় ও মার্টেলের একেবারে সামনাসামনি এসে পৌঁছালো।

***

রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ তোমার কোন কাজে লাগতে পারে। তুমিই...?

মার্টেল হঠাৎ দেখল বিরাট হাত করমর্দনের ভঙ্গিতে ওরই দিকে এগিয়ে এসেছে। মার্টেল উপেক্ষা করে সিগারেট ধরালো।

দিয়েত্রিচ গায়ে মাখলো না। ওর হাতের কাছে ওয়েটার এক গ্লাস পানীয় রেখে গেল।

–তুমি ইংরেজ?

–হ্যাঁ, আমি ইংরেজ।

–আচ্ছা! আমাদের সুন্দর ব্যাভেরিয়াতে ছুটি কাটানো হচ্ছে নিশ্চয়ই?

মার্টেল এবার সেই বিখ্যাত শিল্পপতির দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে খানিকটা অধৈর্যের ভঙ্গিতে বলে উঠলো, তুমি তো একজন নাজী। এই নাজীদের পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

যদি না পৃথিবীটার উত্তরাধিকার পাই। সামনের স্টেট ইলেকশানে নিশ্চিত যে টফলার জিতছেনা। জার্মানীর মতো বড় রাষ্ট্রে কমিউনিস্টপ্রভাব কেমন লাগবে? পশ্চিমের মূল কাজ হলো ওদের একেবারে শেষ করে দেওয়া...সোভিয়েট বিপক্ষে।

–আমি কমিউনিস্ট আর নাজীদের পার্থক্য দেখতে পাইনা। ওরা দুজনেই সমান। এক নায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী। দুজনেরই গুপ্ত পুলিশ বাহিনী কে. জে. বি নয়তো গেষ্টপো। এরা অপরিবর্তনীয়। এদের সিস্টেমটাই তাই। আমি চ্যান্সেলার ল্যাংগের পাটকেই বরং পছন্দ করি। আর এখন যদি কিছু না মনে করো...।

–নাও একটা সিগার। এগুলো হাভানার।

–কিউবার? মার্টেল উঠে দাঁড়ালোকঠিন মুখভঙ্গীতে জার্মানটার দিকে তাকালো,বলে উঠল, ধন্যবাদ। কিন্তু আমি শুধু সিগারেটই খাই। যাই হোক আলাপ হয়ে ভাল লাগল। শুভরাত্রি।

বলে ও এগিয়ে গেল। দিয়েত্রিচ অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে একভাবে তাকিয়ে রইল ওর যাওয়ার দিকে।

মার্টেল লিফটের সামনে পৌঁছতেই রিসেপশনিস্টের সঙ্গে যে মেয়েটা কথা বলছিল সে দৌড়ে গিয়ে হঠাৎই লিফটে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল, দিয়েত্রিচের চোখের সামনে।

***

চারতলাটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। লিফট থেকে মার্টেল আর ক্লেয়ার বেরোলো। মার্টেল ক্লেয়ারকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল। বাথরুমটা ভালভাবে দেখে নিল। পর্দাগুলো সমস্ত জানলায় টেনে দিল।

আধো অন্ধকারময় আলোর পরিবেশে ক্লেয়ার বলতে শুরু করল

–আমি, ঐ দুজন যখন রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করছিল তখন ওদের চিনেছিলাম একজন ভিন আর একজন ওর সহকারী ব্রেজেঞ্জ…।

–আমি জানি…। ওরা পেশাদার খুনী। আমার আশার চেয়েও দ্রুত কাজ হচ্ছে। দিয়েত্রিচ দেখতে এসেছে সেন্ট গ্যালেন, ব্রেজেঞ্জ আর জুরিখের মত এখানেও ওর সাকরেদরা আমাকে সরিয়ে দিতে ব্যর্থ হয় কিনা। কাজটা সারবে ভিনজ আর গ্রস। ক্লারা পেছনে আছে।

ক্লেয়ার বলল, ঐ মহিলাকে ভাল করে নজর রাখা প্রয়োজন..। আচ্ছা দিয়েত্রিচ কি আজ রাতে কিছু করতে পারে?

না। কারণ ও নিজেও এই হোটেলে আছে। এরকম ঝুঁকি ও নেবেনা। আজ রাতে আমরা রিভালবার হাতে পালা করে ঘুমবো।

একটু থেমে মার্টেল অবার বলল, প্রথমে আগামীকাল লিন্ডাউকে জলপুলিশের সার্জেন্ট ডরনারকে সব বলবো। এই লোকটাই ওয়ার্নারের দেহটা এনেছিল। দ্বিতীয়তঃ ডেলটার এখানে একটা ফাঁদ আছে।

ক্লেয়ার গম্ভীর মুখে বলে উঠলো, আমার যেন কেমন নার্ভাস লাগছে। দুটো খুনী,একটা ভয়ঙ্কর মেয়ে আর স্বয়ং দিয়েত্রিচ। আমার মনে হচ্ছে তুমি যা ভাবছে তা থেকেও দ্রুত গতিতে সবকিছু এগোচ্ছে।

অস্পষ্ট–আলোয় ক্লেয়ারের মুখটা ঝাপসা দেখাচ্ছিল।

***

বৃহস্পতিবার, আঠাশে মে :

ঠিক রাত এগারোট নাগাদ বোঝা গেল ক্লেয়ারের কথাই ঠিক। দিয়েত্রিচ বলা যায় আন্ডার এস্টিমেট করেছিল।

ঘরটা একেবারে অন্ধকার। মার্টেল পিস্তল হাতে বসে। কিছু একটা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো।

জানলার পর্দা সরিয়ে নিচে তাকালো। দেখল একটা মার্সিডিস দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির সামনে একটা সোফার। হঠাৎ দিয়েত্রি হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চেপে বসতে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। বন্দরের দিক থেকে একটা গোঙানীর মত শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

মার্টেল সুটকেশটার কাছে এগোলো। একটা হালকা রেনকোট গায়ে চাপিয়ে নিল। ক্লেয়ারকে ডাকতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বলল, কেন কিছু ঘটেছে?

মার্টেল বলে উঠল, দিয়েত্রিচ আমাদের সঙ্গে চালাকি করছিল। এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিল যেন আজ রাতে এখানে থাকবে কিন্তু এইমাত্র গাড়িতে বেরিয়ে গেল। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

–আমরা কি করবো? ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল।

আমাদের একমাত্র করণীয় হলো ওরা যেন মোটেই জানতে না পারে আমরা কোথায়?

–একটু থেমে মার্টেল বলল, যাও এবার শুতে যাও। কেউ যেন দেখতে না পায়।

ক্লেয়ার বলল, তুমি কি করবে?

মার্টেল বলল, আমি এখন স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্ট ডরনারের সঙ্গে দেখা করব। লিন্ডাউতে একমাত্র এই লোকটাকেই বিশ্বাস করা চলে। চারিদিকে ঘন কুয়াশা নামছে। ক্লেয়ার শুতে গেল। মার্টেল দরজা খুললো।

***

রাতের অন্ধকারে মার্টেল বেরিয়ে এল। পাতলা কোট ভেদ করে মার্টেলের ঠাণ্ডা লাগছে। ও লুভউ ইগস্টাসের দিকে এগোতে লাগলো। এদিক দিয়ে সোজা গেলেই পুলিশ হেড কোয়ার্টার।

কোন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু একটা শব্দ বারবার ভেসে আসছিল। সোজা এগোতে থাকল।

রাবার সোলের জন্যে পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটা সত্ত্বেও কোন আওয়াজ হচ্ছেনা। রিভালবারটা যথাস্থানে আছে। সারা রাস্তা জুড়ে এক থমথমে ভাব।

কিছু একটা শব্দ শুনে ওর মনে হল কেউ যেন ওর পেছনে আছে।

হাউপ্টব্যানহফে চরটা ছিল, কিন্তু ও ওদের কিছু কথা শুনতে পায়নি। হঠাৎ ওর যেন মনে হল মার্টেল বেরিয়ে যাচ্ছে।

মার্টেল এবার দাঁড়িয়ে গেল, শব্দটাও থেমে গেল। মার্টেল সমস্যায় পড়লো। নিশ্চয়ই ওকে কেউ অনুসরণ করছে। হঠাৎ মার্টেল চলতে আরম্ভ করলো। ওর যেন মনে হলো

কুয়াশার মধ্যে আরো কিছু লোক ওকে অনুসরণ করছে। ডেলটা সমস্ত কিছুই নিখুঁতভাবে করে থাকে। জুরিখের ব্যাপারটা ও ভোলেনি। রাস্তায় একটা লেখা চোখে পড়ল ক্রমডান্স্যাসে।

মার্টেল দ্রুত দরজার দিকে এগোতে লাগলো। মার্টেলের গুলি লোকটার মাথায় সজোরে লেগেছে। নোকটা পড়ে গেল।

মার্টেল এবার দৌড়ে গলিটা দিয়ে ঢুকে, ডানদিকে বাঁকলো। রাস্তার সামান্য আলোয় লেখাটা চোখে পড়তে দরজার সামনে গিয়ে দরজাটা দ্রুত খুলতেই একটা পুলিশ প্রহরী ওর দিকে কুঁচকে তাকালো।

কাউন্টারে গিয়ে ও একটা কার্ড সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো। পিস্তলটা ভেতরে ঢুকিয়ে রাখলো।

কাউন্টারের লোকটাকে বলল, সার্জেন্ট ডরনার তাড়াতাড়ি। বাড়িতে থাকলে বিছানা থেকে তুলে আনো। আমার চিহ্নটা দেখাও গিয়ে। ক্র্যাম্যাগসেতে দুটো লোক পাঠাও। ওখানে মৃতদেহটা আসার আগেই...।

***

উনত্রিশে মে,শুক্রবার :

বৈরিশচার হফে রুদ্ধদ্বার শলা-পরামর্শ করলো তিনজনে–কেইথ মার্টেল, সার্জেন্ট ডরনার আর এরিখ স্টোলার।

এদিকে টুইউ তার ফ্লাটে সেন্ট গ্যালেন থেকে মার্টেলের পাঠানো রিপোর্টের টেপ পরীক্ষা করছিল। মোট পাঁচবার শুনল ওর রেকর্ডটা।

ক্লেয়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী ওয়ার্নারের অপারেশন ক্রোকোডাইলের তিনটে দিক আছে।

সেদিনে আরও একটা ব্যাপার ঘটছিল। হাওয়ার্ডের প্যারিসে বিমানে করে যাবার কথা। ওখানে চারজন সিকিউরিটি চীফের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। কারণ একজন ভি, আই পি প্যারিস থেকে সামিট এসে ভিয়েনার দিকে যাবে। আর পাঁচদিন বাকি।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যাটলান্টিকের ওপর দিয়ে সোজা ওরাল এয়ারপোর্টে পৌঁছবে। তারপর সেখানে থেকে দ্রুত গতিতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে আমেরিকান সিক্রেট সাভির্সের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান টিম ও'মিয়েরার ওপরে সমস্ত কিছু দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছে। একে টুইড মাত্র একবারই দেখেছে। সাক্ষাৎকার সম্প্রতিই ঘটেছিল। চারনম্বর ভি. আই. পি হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার কার্ট ল্যাংগার। এর পরের দিন সকালেই থাকবার কথা।

ক্লারা বেক হাতে একটা বাইনোকুলার নিয়ে সীটে বসেছিল। ও কিন্তু একেবারেই ভোলেনি যে, মার্টেল ওর উপস্থিতির কথা সার্জেন্ট ডরনার আর স্টোলারকে আগের রাতেই জানিয়েছে।

মার্টেল ফোন করতেই ডরনার বলে উঠেছিল, আমার লোক আগেই জানিয়েছে ক্লারা বেক হোটেলে উঠেছে।

হু। মার্টেল বলেছিল।

এবারে স্টোলার বলেছিল, কেন?

কারণটা হচ্ছে ডেলটা ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি যে আমি জানি যে ক্লারা ওদের চেনে। ক্লারা এখানে আসার পরে দিয়েত্রিচ বা ভিনজ কিংবা রন্ড গ্রস কারোর সঙ্গেই ওর যোগাযোগ হয়নি। সুতরাং গুপ্তচর হিসেবে ঐ সবচাইতে উপযুক্ত। সকালবেলা আমি ওকে...।

সেই মতোই কাজ এগোচ্ছে। এখন মার্টেল ক্লারাকে ব্যবহার করতে চাইছে। ক্লেয়ার নির্দেশমত বাইনোকুলার দিয়ে চারিদিক দেখছিল। ক্লারাও তাই। এবার দুজনেরই বাইনোকুলার সরাসরি মার্টেলের দিকে এগোতে লাগলো।

ক্লেয়ার আপন মনেই বলে উঠলো, প্রিয়তম তুমি খুব তাড়াতাড়ি এগোচ্ছো।

ক্লেয়ার একসময় ওর জায়গা ছেড়ে বন্দরের সামনের জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ালো। চারিদিকে সূর্যের আলো ঝলমল করছে। ও বেকের সীটের একেবারে কাছাকাছি চলে এলো। ক্লারা তখন, উঠে বৈরিশ্চার হফের প্রবেশের মুখটায় এগিয়ে গেছে। মার্টেল তখন ওয়েটারের সঙ্গে কথা বলছিল। এদিকে বেক রাস্তায় পৌঁছে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়েছে। তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাউপ্টব্যানহফ। দ্রুত এগিয়ে সামনের একটা দরজা খুলেই ক্লেয়ার বাঁ দিকে তাকালো। বেক তখন টেলিফোন বুথে ফোন করতে ব্যস্ত। ক্লেয়ার একটা বইয়ের স্টলে বই উল্টে দেখতে লাগল।

***

ক্লারা তখন ভেতরে স্থানীয় একটা নম্বরেই ডায়াল করেছে। বারবার ও স্টেশনের সামনের দিকটায় তাকাচ্ছে। ওখানে কেউ নেই।

ফোনের ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো, হেগেন কথা বলছি...।

–ওয়ানবার, আমি ক্লারা।

–আমরা প্রস্তুত।

–মাল লঞ্চ ঠিকঠাক করে নিয়েছে। এবারে যাওয়ার পালা।

সংযোগ ছিন্ন করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে হোটেলের দিকে এগোল।

সামনে পেভমেন্টে শিল্পীটার কাছে একবার থামলো, ভাবখানা এমন যেন ওর আঁকা ছবি দেখছে। কিন্তু ও ফিসফিস্ করে বলে গেল যা হলো, পুলিশের ওপর নজর রাখো। লঞ্চ নিয়ে আসছে।

সিগারেট ধরিয়ে ক্লারা লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে গেল। মনে মনে ভাবলো। এবার দ্বিতীয় ইংরেজটারও শেষ হবার পালা।

লুডউইগস্ট্রাসেতে বন্দরের দিকে সার্জেন্ট ডরনার অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল।

আচমকাই একজন মহিলার সঙ্গে ওর ধাক্কা লাগলো। লাগতেই দুহাতে ও মহিলাটির কাঁধ দুটো ধরে চেঁচিয়ে বললো, কিছু মনে কোরনা। দোষ আমারই, দেখতে পাইনি। মহিলাটি ততক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ও আর কেউ নয় স্বয়ং ক্লেয়ার হফার। ডরনারের পরনে সিভিলিয়ান ড্রেস।

এরপরে কানের কাছে ফিসফিস্ করে উঠলো, সমস্ত কিছু ঠিকঠাক আছে। এখন থেকে পনের মিনিটের মধ্যে দ্বীপটাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এরপরেই ডরনার ক্লেয়ারকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল এবং ক্লেয়ারওঁ বন্দরের রাস্তায় যাবার জন্যে সোজা রাস্তা ধরলো। মার্টিন তখন লঞ্চ নিয়ে ব্যস্ত। বাঁধের সামনে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ও নামছিল লঞ্চের ভেতরে।

ক্লেয়ার একবার ডানদিকে তাকাতেই দেখতে পেল সেই শিল্পীব্রাউন পেছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লেয়ার তখন মাথায় একটা লাল রুমাল জড়িয়েছে।

মার্টেল লাল রুমালের সংকেত পেয়েই বুঝলো সবকিছু ঠিকঠাক জায়গাতেই আছে। একবার দেখলো সার্জেন্ট ডরনার যে দিকে একটা বিরাট লঞ্চ রয়েছে ঠিক সেই দিকে এগিয়ে চলেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ও ক্লেয়ারকে লক্ষ্য করতে লাগল। ও তখন খোলামেলা গোছের স্নানের জায়গাটার দিকে এগোচ্ছিল। লেকের কাছে একটা পাঁচিলের আড়ালে স্নানের জায়গা।

পুলের কাছে পৌঁছে ও একটা ঘরে ঢুকলো। টিকিট আগেই কাটা ছিল। সেখানে সব কিছু খুলে ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে পিস্তলটাও রাখলো। তারপর ব্যাগটাকে কব্জির সঙ্গে একটা চামড়ার ফালি দিয়ে আটকাল।

এরপরে ঘরের মধ্যে ওর আর একটা ব্যাগ ফাঁকা অবস্থাতেই পড়ে রইল। দরজাটা বন্ধ করলো। ঘড়িটা দেখে নিল। তারপর বাইরে এসে ধীরে ধীরে সরোবরের দিকে এগিয়ে গেল। এবার ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা।

এদিকে মার্টেল দড়ি বেয়ে লঞ্চের ভেতরকার হুইল ঘরের মধ্যে ঢুকছে। ঘড়িটা একবার দেখল। ও আগেই ডরনার আর. ক্লেয়ারের সঙ্গে ঘড়িটা মিলিয়ে নিয়েছে। আর দুমিনিট বাকি ও একটা সিগারেট ধরালো।

কোনস্ট্রাঞ্জ লেকের কুয়াশায় অস্টিন উপকুল মোটেই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এদিকে মার্টেল, ডরনার আর স্টোলারের সঙ্গে পরিকল্পনা করে নিয়েছে।

এই মুহূর্তেই স্ট্যান্ড পোলিজির অফিস থেকে বি. এন. ভির, প্রধান ব্যক্তিটি অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে।

মার্টেল বন্দরের পূর্বদিকে তাকায়নি। দুটো লঞ্চ কাছি দিয়ে নোঙর করা। ঐ জলপুলিশের লঞ্চ দুটোর নেতৃত্বে আছে সার্জেন্ট ডরনার, ডেকের নীচে পোক বদলে ও দাঁড়িয়ে আছে। মার্টেল আবার ঘড়িটা দেখল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে এগোতে লাগলো।

এদিকে স্ট্যান্ডপোলিজির অফিসের মধ্যে এরিখ স্টোলার জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। ট্যুরিস্টরা সব টেবিলে বসে খাচ্ছে। ওর ভারী টেবিলটার পেছনে একটা ট্রানস্কিভার। অপারেটরও আছে। চাবি কিন্তু স্টোলারের নিয়ন্ত্রণে।

ট্রানস্কিভারটা ব্যবহার করলে রাস্তা, ব্রীজের ওপরে পুলিশের গাড়িগুলো, রেলওয়ে এমব্যাকমেন্টের কাছে মূল রাস্তার গাড়িগুলোর খবরের ব্যাপারে সুবিধা হয়। এখন এটার যোগাযোগ সরাসরি একটা পুলিশ লঞ্চের সঙ্গে, যেখান থেকে ডরনার রিপোর্ট করল যে, মার্টেল এগিয়ে চলেছে।

উপকূল জায়গাটা বরাবর কুয়াশায় ঢাকা। পাঁচজন উইন্ড সারফার তীর ধরে এগোচ্ছিল। ওরা লিন্ডাউ আর ব্রেজেঞ্জের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। ওদের নেতা ওয়ার্নার হেগেন ওদের দিকেই আসছিল। ও ক্লারা বেকের একটা ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

-ও লিন্ডাউ বন্দর ছাড়ছে।

ও নৌকোয় এগোতে এগোতে বলল, ধূসর রঙের। মার্টেল একা।

আর যারা নৌকো চালাচ্ছিল তাদের পরনে সাঁতারের পোষাক, প্রত্যেকের কজীতেই একটা করে বেল্ট আর তাতে ছুরি আটকানো। বাতাস শান্তভাবে বয়ে চলেছে।

ওদের পোষাকে একটা করে ব্যাজ আটকানো আছে। লিন্ডাউ বন্দর থেকে আধ মাইল দূরে। ওয়ার্নার হেগেনের নেতৃত্বে ঘাতক দলটা এগিয়ে চলেছে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এত কুয়াশার মধ্যেও তোমাকে দেখতে পেয়েছি তার জন্যে...।

ক্লেয়ার ততক্ষণে মার্টেলের লঞ্চের ওপর বসে আছে। মার্টেল ওর চামড়ার থলিটা খুলে ওয়াটার প্রুফ ব্যাগটা পাশে রাখলো।

লঞ্চটা এখন দাঁড়িয়ে আছে। মার্টেল বন্দর থেকে ঠিকঠাকই এটাকে বের করে নিয়ে এসেছে।

বাতাস বয়ে চলেছে। আইনভঙ্গ করেনি কোনরকম। ক্লেয়ার বেশ খানিকটা পরিশ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ওরা কি আসবে?

–দেখা যাক্।

ক্লেয়ার ব্যাগ থেকে পোষাক আর ন মিলিমিটার পিস্তলটা বের করলো। বলে উঠলো, এটা পড়লে কি ভাল হবে...।

মার্টেল ওর নিজের ৪৫ কোল্টটা একবার দেখে নিয়ে কাঁধের আবরণীর মধ্যে রেখে দিলো।

ক্লেয়ার বলে উঠলো, পোষাকটা সিনথেটিক...।

মার্টেল তখন অন্য জগতে। ইঞ্জিন বন্ধ অবস্থায় লঞ্চটা ধীরে ধীরে হাওয়াতেই ভেসে চলেছে। ধূসর কুয়াশা আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে।

ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল, তোমার কি মনে হয় ওরা আসবে?

–এইটাই তীরভূমি থেকে সবচেয়ে কম দূরত্বের। মিনিট খানেকের মধ্যে তুমি মুখোশটা পরে নাও, ওদের কেউ যাতে তোমাকে না চিনতে পারে।

আরে এটা? স্টাইল হাউসের ছোট চার্ট টেবিলের ওপরে যন্ত্রটা পড়ে ছিল। বেশ বড়ো। আবার বলল, এটা রাডার নাকি?

না। এটা একটা টেপ-রেকর্ড করা সিগন্যাল, যার দুটো ব্যাপার আছে। যখন আমি একটা বোতাম টিপবো তখন ওটা স্টোলারের হেড-কোয়ার্টারে সিগন্যাল দেবে, আর তখন ওরা বুঝবে আমরা বিপদে পড়েছি। আর সিগন্যালটা যখন অনবরত হবে তখন ডরনার পুলিশ লঞ্চ থেকে বুঝবে আমরা কোথায় আছি।

–বাঃ, চমৎকার ব্যাপার।

–কেননা ওয়ার্নার মারা যেতেই বুঝেছি আমাদের বিপক্ষ ব্যক্তি অতিরিক্ত বুদ্ধিমান...।

–রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ?

না। ও আর একজন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী, নাম ম্যানফ্রেড।

মার্টেল হুইল হাউসের ভেতর ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার অপেক্ষায়।

মার্টেল এবার বললো, নাও মুখোশটা পরে চুপচাপ বসো।

বলেই মার্টেল ইঞ্জিন স্টার্ট করলো। পশ্চিমের কুয়াশা সরে গিয়ে জলের রঙটা নীল দেখাচ্ছিল। লিন্ডাউ বন্দরের পূর্বদিকের পাঁচিলের ওপর ব্যাভেরিয়ার সিংহটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ক্লেয়ার মুখোশটা ঠিক করে নিলো। প্যান্টের ওপরের দিকে পিস্তলটা ঠিক রাখা আছে কিনা দেখে নিল।

ওয়ার্নারের বেলাতে ওরা যেমন এসেছিল, ঠিক যদি ওরা তেমনই আসে তাহলে আমার একজনকে দরকার।

মার্টেল লঞ্চের স্পীডটা অল্প বাড়িয়ে দিতে লঞ্চটা ধীরে ধীরে নির্জন জায়গার ভেতর দিকে এগোতে থাকলো। ওয়ার্নার এখানেই এসেছিল।

মার্টেল একটা ব্যাপারে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। পূর্বদিকে লঞ্চ আর অস্ট্রিয়ান ঘাট বরাবর একটা ধূসর কুয়াশা যেন সবটা ঢেকে আছে। অন্য কারোর পক্ষে ওকে খুঁজে

পাওয়া অসুবিধাজনক হবে। লঞ্চে ওপরে উঠলে তবেই দেখা পাবে, সেটাও আর ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অপর পাঁচজন উইন্ড সাফারকেও সংকেত করলো। ওরা পরস্পর একে অন্যের কাছাকাছি রয়েছে, যাতে কেউ কাউকে না হারায়।

এবারে ওরা লক্ষ্যবস্তু দেখা যাচ্ছে বুঝতে পেরে এগিয়ে যেতে লাগলো। কুয়াশা তখন সরে যেতে আরম্ভ করেছে।

হেগেন সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক সময় মতো করছে। ওর একটা চোখ পর্দায় আর একটি চোখ দেওয়ালের দিকে। এবারে বাঁ-হাতে মাস্তুলটা আর ডানহাতে সেই বিশেষ ধরনের ছুরি যেটা ওয়ার্নারের পেছনে ডেলটা প্রতীক এঁকে দিয়েছিল।

এবার ও লঞ্চটা আসতে দেখেই অন্যদের আসতে সংকেত দিলো।

সমস্ত দলটা অর্ধচন্দ্রাকারে এমনভাব এগিয়ে আসতে লাগলো যাতে মার্টেলকে জোর করে আটকাতে পারে।

ব্যাপারটা ঘটছিল অত্যন্ত দ্রুতভাবে। মাঝে কুয়াশায় হুইল হাউসের মধ্যে থেকে আসা ছবিটা । অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ছজন উইন্ড সার্ফার-এর মধ্যে তিনজন এমনভাবে এগোচ্ছিল যাতে মার্টেলকে যেন তেন প্রকারেণ আটকানো যায়।

ধর ঠিক এইখানে এখন। মার্টেল ক্লেয়ারকে বলতে বলতে বোতামটা টিপল।

–আমি ওদের দেখতে পেয়েছি। বলেই ক্লেয়ার পিস্তল বের করে সামনের দিকে উঁচিয়ে ধরলো।

-ওরা আক্রান্ত।

রাডারের পর্দায় বেতার সংকেতটা ফুটে উঠেছে। সার্জেন্ট ডরনার পুলিশ লঞ্চের ভেতরে।

সংকেত পাওয়ামাত্র ও ইঞ্জিনটা স্টার্ট করতেই বিকট শব্দ করে লঞ্চটা এগোতে থাকলো।

এই সময় কোন লেক স্টীমার ভেতর ঢোকেনা, ডরনার একথা জানা সত্ত্বেও নিয়ম মেনেই ও সাইরেন বাজাতে বাজাতে এগোতে লাগলো।

বাইরের দিকটায় এসে গর্জন থামাল।ওর লঞ্চনব্বই ডিগ্রি কোণ বরাবর ভেসে যেতে লাগলো। তারপর দুটো প্রাচীরের মাঝামাঝি এসে ইঞ্জিনটা আবার স্টার্ট করলো। সাইরেনও একটানা বেজে যেতে লাগল। পর্দায় তখন বেতার সংকেত হচ্ছে।

ওখানে ঠিক সময়ে পৌঁছতে হবেই–ডরনারের ঈশ্বরের কাছে এখন এই প্রার্থনা।

***

ক্লারা বেক ঠিক করেছিল যে ব্রাউনের সঙ্গে কোন উত্তেজনায় যাবে না। টেলিফোনটা করার পর সামনের দিকের সীটে বসে স্বচ্ছ মেজাজে টুরিস্ট্রের মতো চারদিক দেখছিল।

হঠাৎ পুলিশ লঞ্চটা আসতেই ও দ্রুত রাস্তা পার হয়ে হাউস্টব্যানহফের দিকে এগোতে লাগলো।

তারপর যে জায়গায় থামলো সেখানে সারি সারি টেলিফোন বুথ, কিন্তু সবগুলোতেই স্টিকার লাগানো টেলিফোন খারাপ বলে।

ঠিক সেই সময়ে একটা পুলিশকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ও খুব ভয় পেল।

পুলিশটা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি ফোন করতে চাও?

–সব কটাই তো খারাপ। ক্লারা একটু জোরে বলে উঠল।

–হ্যাঁ। সেইরকমই তো দেখছি। পুলিশটা নরম স্বরে বলল, সবগুলোই খারাপ।

ধন্যবাদ।

হাউপ্টব্যানহফ থেকে বেরিয়ে ক্লারা দ্রুত বৈরিশ্চার-এর দিকে এগোতে থাকলো। ঘরে পৌঁছে ফোনে একটা নম্বর ডায়াল করল। অপরপ্রান্তে একটা মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

–আমি দুঃখিত। ফোনগুলো সব হঠাৎই সাময়িক খারাপ হয়ে গেছে। তুমি চটপট আমায় নম্বরটা দাও। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...।

ব্যাপারটা জরুরীনয়। উত্তেজনাকে প্রাণপণে দমন করে ক্লারা রিসিভারটা রেখে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। কি ব্যাপার ঘটছে। কে জানে। দিয়েত্রিচের কাছে না আবার ধমক খেতে হয়।

.

-মেনল্যান্ডের-এর সব লাইন কেটে দাও...।

মার্টেলের এই সংকেত পাওয়া মাত্রই এরিখ স্টোলার সমস্ত পুলিশ স্টেশনে নির্দেশ পাঠিয়ে দিলো। লিন্ডা দ্বীপে টেলিফোনে যোগাযোগের আর কোন ব্যবস্থাই রইলনা। বাইরের পৃথিবী। থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল লিন্ডাউ।

নির্দেশ পাওয়ামাত্রই দ্বিতীয় পুলিশটা ঘর থেকে বেরিয়ে রেডিও কন্ট্রোল অফিসে গেল। পেট্রোলকার গুলোতেও সংকেত পাঠিয়ে দেওয়া হল। মূল ভূখণ্ডে যাবার সেতুটা আটকে দেওয়া হলো। মূল ভূ-খণ্ডের রেলওয়ে এমব্যাংকমেন্টের একেবারে শেষ প্রান্তে আরও একটা পেট্রোলকার দেখা গেল। সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

লিন্ডাউ-এর সিগন্যাল বক্স নিয়ন্ত্রণ, রেল ট্রাফিকে ত্রুটি বেরোনোর ফলে সমস্ত ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল। এখন কি ঘটছে কে জানে?

***

ওয়ার্নার হেগেনের নিজের ওপর প্রচুর আস্থা। উইন্ড সার্ফার-এর টীমটা ওর নেতৃত্বে আছে। লঞ্চটাকে সবাই গোল হয়ে ঘিরে ধরবে। সমস্ত ব্যাপারটাতেই, চমক।

সোনালী চুলের দৈত্যটা স্থির লঞ্চটার দিকে প্রথম পৌঁছলো। ঐ জায়গাটাতেই খালি পা-টা রাখলো। ডান হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে বড় ব্লেডের ছুরি।

প্রথমেই যা দেখে ও অবাক হলো। একটা মুখোশ মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মার্টেল খানিক পরে বেরিয়ে এলো। হুইল হাউসের মধ্যে নৌকোর হুকটা এমনভাবে আটকানো যে হেগেনের মাথাটা একপাশে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেল। ধাক্কা খেয়েই মার্টেলের লঞ্চের মধ্যে ছিটকে এসে পড়ল। আর মার্টেল ওর বন্দুকের কুঁদো সরাসরি ওর মাথায় আঘাত করতেই সঙ্গে সঙ্গে হেগেন চেতনা হারালো। এবারে দ্বিতীয় লোকটা ছুরি হাতে এগিয়ে এলো। ক্লেয়ার লোকটার বুকে তিনবার গুলি চালালো। রক্তে ভেসে গেল চারিদিক। মার্টেল চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। চারজন পালিয়েছে। তিনজন তখনও ঘিরে আছে। আর এগিয়ে আসার জন্যে উদ্যোগ নিচ্ছে। ও ক্লেয়ারকে সতর্ক করে দিয়ে হুইল হাউসে ঢুকে লঞ্চটাকে পূর্ণ বেগে চালিয়ে দিল।

তিনজন তখনও ওর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে। লঞ্চ দ্রুতবেগে এগোতে এগোতে হঠাৎ থেমে গেল তারপর এত জোরে এগোলো যে বাড়ানো অংশটাতে রীতিমত আঘাত সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিলনা। ধাক্কার আঘাতে একজন ছিটকে পড়ে যেতে যেতে আর্তনাদ করে উঠল। মনে হল নোকটার পুরো শরীরটাই ভেঙ্গে গেছে। আর দুজন লোক জলে ভাসতে লাগলো। সমস্ত জল রক্তে লাল। ওদের মাস্তুলগুলো ভেঙ্গে চুরমার।

–আমাদের পেছনে আর একজন...। ক্লেয়ার বলে উঠল।

মার্টেলের লঞ্চটা এবার পেছন দিকে এগোতে লাগলো ঠিক লোকটাকে লক্ষ্য করে। প্রচণ্ড আঘাতে লোকটা ছিটকে প্রপেলারের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মার্টেল বলে উঠলো, ক্লেয়ার চলো পালাই, এখুনি ডরনার এসে পড়বে। মনে হয়।

***

উনত্রিশে মে, শুক্রবার :

প্যারিসের এক উজ্জ্বল দিন। হাওয়ার্ড চার্লস দ্যগলে উড়ে গিয়ে পৌঁছল। সামিট এক্সপ্রেসের নিরাপত্তার ব্যাপারে আজই চূড়ান্ত কনফারেন্স। অদ্ভুতভাবেই ও দেশীয় পোষাকে ভ্রমণ করছে।

বিমানবন্দরে অ্যালেন ফ্ল্যাড্রেসের পাঠিয়ে দেওয়া গাড়িতে ও সারেটের অফিসিয়াল হেডকোয়ার্টার এগারো নং রু দ্য সাউসেইসে এসে পৌঁছলো। অত্যন্ত সংকীর্ণ জায়গা বলে টুরিস্টদের কদাচিৎ দেখা যায়। খিলান আকৃতির প্রবেশপথে উর্দি পরা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধরনের মিটিং-এর জন্যে ফ্ল্যান্ড্রেস একেবারে সুরক্ষিত পুরোন বিল্ডিংটাই ঠিক করেছে। সাদা পোষাকের গোয়েন্দাদের অবিরত আনাগোনা। তিনজন সিভিলিয়ান তিনটে

পৃথক গাড়িতে আসায় তেমন একটা উত্তেজনার সঞ্চার হল না। ফরাসী সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান হাওয়ার্ডকে অভ্যর্থনা জানালো। তিনতলার একটা টেবিলে বসে ছিল ও।

হাওয়ার্ড বলে উঠলো, অ্যালেন তোমাকে দেখে আমি ভীষণ আনন্দ পেলাম।

প্রিয়তম বন্ধু। তোমাকে আমি প্যারিসে স্বাগত জানাচ্ছি।

ফ্ল্যান্ড্রেস ওর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বলে উঠলো।

পাশেই একজন বসেছিল। তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলো, তুমি নিশ্চয়ই টিম ওমিয়েবাকে চেন। সবেমাত্র ওয়াশিংটন থেকে...।

বাঃ, চমৎকার হবে। আমেরিকান ভদ্রলোক বলে উঠলো। চেয়ার থেকে না উঠেই হাওয়ার্ডের সঙ্গে করমর্দন করল। গোলাকার টেবিলের চারপাশে সবাই বসল। ফ্ল্যান্ড্রেস মদের গেলাসগুলো সাজাতে আরম্ভ করল। হাওয়ার্ড ওর সামনে একটা নতুন প্যাড আর পেনসিল রাখলো। ওমিয়েবার দেহটা সুগঠিত, চোখে চশমা আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর। ওমিয়েবার মুখমণ্ডলে কোনরকম ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

টিম ও'মিয়েরাই আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের একমাত্র প্রধান যে গত একবছরে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল না।

ফ্ল্যান্ড্রেস মদের ব্যবস্থা করতে করতে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। লাউঞ্জ স্যুটে ওকে দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছিল। কালো সরু গোঁফ ও ব্রাশ করা চুলের সঙ্গে ফরাসীদের মতো মসৃণ দেহটা মানানসই লাগছিল ওকে।

যে কোন মুহূর্তে জার্মানী থেকে এরিখ স্টোলার আসতে পারে। পরক্ষণেই গ্লাসটা সামনের দিকে তুলে ধরে বলল, ভদ্রমহোদয়রা সুস্বাগতম!

বিয়ারে এবার ও চুমুক দিল। হাওয়ার্ড ততক্ষণে এক চুমুকে সবটুকু সাবাড় করে দিয়েছে। ফ্ল্যান্ড্রেস লক্ষ্য করছে ক্রমশ সকলের মুখে একটা কঠিনভাব জেগে উঠছে আর প্রত্যেককেই কেমন যেন নার্ভাস বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ দরজা খুলে এরিখ স্টোলার প্রবেশ করল আর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

প্রথমেই দেরীতে আসার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

–একটা অবাঞ্ছিত সমস্যার ব্যাপারে বলা যাক...। বলা আরম্ভ করলও।

তখন সবে বিকেল হতে আরম্ভ করেছিল। সকালে যে সবদিক থেকে বিচ্ছিন্ন লিন্ডাউ দ্বীপে ও ছিল এটা প্রকাশ করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না ওর। প্যারিসে আসার জন্যে মরিয়া হয়ে মিউনিক বিমান বন্দর থেকে প্লেন ধরে ওর এখানে পদার্পণ।

–খানিকটা বিয়ার খেয়ে ও আবার স্থির হয়ে গেলো। ও অসম্ভব মনঃ বিশেষজ্ঞ।

খানিকক্ষণ বাদে বলে উঠল, টুইড কোথায়? আমি আশা করেছিলাম।

হাওয়ার্ড নীরসভাবে উত্তর দিলো, টুইড এখন বাড়িতে।

-তাই নাকি? তোমরা দুজন তো একই বয়েসী,বলে স্টোলার গ্লাসে আর একটু বিয়ার ঢেলে চুমুক দিলো।

হাওয়ার্ডের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, বললো, ব্যাপারটা ওর এক্তিয়ারে নয়। হতে পারে কোন বিষয়ে আমরা দুজনেই এখন প্যারিসে...।

-ঠিক আছে। ফ্ল্যান্ড্রেস বলে উঠলো। একটু থেমে আবার বলল, আমার কাছে সামিট এক্সপ্রেসের রুটটা আছে,বলে ও একটা বড় আকারের উত্তর-ইউরোপের ম্যাপ খুলতেই সবাই ম্যাপটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল। রুটটা লাল রঙে চিহ্নিত। এরপর ও একটা সিগারেট ধরাল।

অ্যালেন ফ্লানড্রেসের স্বভাব অনেকটা নাটকীয় ধরনের। ম্যাপটা দেখতে দেখতে ও হালকা কিছু মন্তব্য করলো।

কার্লোসকে দেখা গেছে–ম্যানফ্রেড তুমি যা ইচ্ছে, সেরকম বলতে পারো। আজ সকালেই লন্ডন থেকে পাওয়া পিকাডিলী...।

ম্যানফ্রেড। তুমি কি করে জানলে লন্ডনে কি ঘটছে? তাছাড়া কেউ কি আমাকে বলবে যে, ও সত্যিই কার্লোস কিনা?

হাওয়ার্ড একরকম কেটে পড়ায় ফ্লানড্রেস একটু আশ্চর্য হলো।

ফ্রেঞ্চম্যান এবার স্বাভাবিক স্বরেই বলতে লাগলো, আমার সহযোগী একটা মেয়ে, রেণী ডুভাল, এই মুহূর্তে ফরাসী দূতাবাসে কাজ করছে। ওর কাছ থেকেই টেলেক্সটা পাওয়া গেছে। বাকিটা তোমার কাগজে।

ফেঞ্চম্যানের দেওয়া কাগজটা ও পড়তে লাগলো। এরিখ স্টোলার কার্লোস-এর ব্যাপারে বলতে লাগলো, কার্লোস-এর কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। ম্যানফ্রেডেরও নেই। কার্লোস ও ম্যানফ্রেডের ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নয়। লোহার বেড়াজালের মধ্যে থেকে মাঝে মধ্যে কার্লোস বেরিয়ে আসে, ম্যানফ্রেডও তাই। দুজনেই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। কেবলমাত্র প্রয়োজনে ওরা অবশ্য কে. জি. বি-কে সহযোগিতা করে।

–তাহলে দুজন? হাওয়ার্ড বলল।

–অথবা, মিয়েরা বলে উঠলো এবার। প্রকৃত কার্লোস তাহলে কে? তুমি এটা আমাকে বলল এরিখ, যদি দুজনেই থাকে, তাহলে দুজনেই দুর্ধর্ষ খুনী..।

ফ্ল্যানড্রেস অ্যামেরিকান। পরবর্তী কথায় হাওয়ার্ড ভুরুটা কুঁচকালো।

তুমি আমাকে লন্ডনের ব্যাপারটা ভালভাবে বলতে পারো? ও কেমন পোষাক পড়েছিল? কেনই বা ওকে এত সহজে চেনা যাবে?

হাওয়ার্ড অস্ফুটস্বরে বললো, ওর স্বাভাবিক পোষাক উইন্ডচিটার, জিন,কালোরঙের বেরেট আর বড় চশমা।

এবারে জার্মান ভদ্রলোক বলে উঠল, তুমি ঘটনাটা আমাকে একটু বিশদভাবে বল তো?

রাস্তায় টহল দেবার সময় একটা পুলিশ ওকে চিনতে পারে কার্লোস বলে, অবশ্য ও যদি সত্যিই কার্লোস হয়ে থাকে। রিজেন্ট স্ট্রিট দিয়ে গিয়ে সোয়ালো স্ট্রিটে ও কোথায় উধাও হয়ে যায়। পুলিশটা ওকে অনুসরণ করেছিল কিন্তু ও ভীড়ের মধ্যে কোথায় মিশে যায়। পরে মার্টিন রোডের একজন সহকারী ওকে দেখতে পায়। উইন্ডচিটার চেয়ারে বসে, চশমাটা ওপরের দিকে। ঠিক আটত্রিশ তলায় স্মিথ অ্যান্ড ওয়েলসন। একেবারে লোডেড বুঝেছ ব্যাপারটা...।

পেট্রোল পুলিশ। লোকটা রাস্তার ঐ বিশেষ জায়গাতেই চলাফেরা করছিল? স্টোলার বলে উঠল।

–আমার মনে হয় তাই। আই. আর. এ. সন্দেহ করেই একটা চোখ অন্ততঃ খোলা রেখেছিল। তাতেই বা কি? হাওয়ার্ড বলে উঠল।

–কেউ যদি ওরকম পোকই পড়ে, তাহলেও পুলিশ কি করে নিশ্চিত হয় যে ওকেই দেখেছে অথবা অদৃশ্য হয়ে গেছে?

–এই একই কথা আমিও ভাবছি...।

ও'মিয়েরা সিগারেট ধরালো। স্টোলার এতক্ষণ উত্তেজিত কথাবার্তা বলার পর একেবারে ঠাণ্ডা। ফ্ল্যানড্রেস দেখলো জার্মানটা একজনকেই গভীরভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কিন্তু বি. এন. ডির প্রধান...।

www.bengaliebook.com

এবারে ওরা সবাই ভিয়েনা সামিটে রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যে সব জায়গায় ট্রেনগুলোকে থামানো হবে, জায়গাগুলো ম্যাপে লাল রঙে চিহ্নিত করা আছে।

রুটটা এরকম। প্যারিস থেকে স্ট্রামবুর্গ। তারপর স্ট্রামবুর্গ থেকে স্টাটগার্ট আর মিউনিখ হয়ে স্যালজবুর্গ তারপর জার্মানী। একেবারে শেষ পর্যায়ে স্যালজবুর্গ থেকে ভিয়েনা..অ্যামেরিকা, এতে অস্ট্রিয়ানদের সামান্য সহযোগিতা প্রয়োজন। অ্যালেনই রসিকতার মেজাজে বেশির ভাগ কথা বলে যাচ্ছিল।

হাওয়ার্ডের ভ্রাম্যমান টীম তিনটে সেক্টর দেখবে। ফ্ল্যানড্রেস নিখুঁতভাবে ওর সেক্টরগুলো দেখে যেসব জায়গায় ও সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে সেগুলো বিপজ্জনক অঞ্চল বলে চিহ্নিত করলো।

এবারে এরিখের পালা। ও'মিয়েরা এক্ষেত্রে গভীরভাবে আবির্ভূত। জার্মান ভদ্রলোক ম্যাপের একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে এসে থামলো। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাতাসহীন। ঘরে একটা উত্তেজনা ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

–ঠিক এই জায়গাতে এক্সপ্রেস ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করবে। এই জায়গাটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হল ট্রেন এই অঞ্চলটা দিয়ে যাবার পরই স্টেটের নির্বাচন।

–এখানেই নয়া নাজীদের তৎপরতা? ডেলটা? হাওয়ার্ড ভ্রূ কুঁচকে বললো।

–টফলার। ও’মিয়েরা বলল। অনেকটা কৈফিয়তের ভঙ্গীমায় বলে উঠল, ডেলটা পোষাক . আর অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর সমর্থনও বেড়ে যাচ্ছে। টফলারকে প্রায় কমিউনিস্ট বলা যায়। ওর আসল উদ্দেশ্য হল পশ্চিম জার্মানী থেকে ব্যাভেরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে অস্ট্রিয়ার মতো একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তৈরী করা। এতে গ্যাটের প্রতিপত্তি একেবারে শেষ হয়ে যাবে। পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েটের হাতই শক্ত হবে।

স্টোলার শান্তভাবে বলে উঠল, চ্যান্সেলার ল্যাংগারের পরামর্শদাতারা ভবিষ্যতবাণী করেছে যে টফলার জিততে পারবে না।

আলোচনা এইভাবে সন্ধ্যে অবধি গড়িয়ে চলল। একইসাথে খাওয়াদাওয়াও চলতে থাকলো। ফরাসী ভদ্রলোক গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে পাশের বন্ধুদের দিকে তাকাচ্ছিল। বাতাসে একটা উষ্ণ, আঠালো ভাব। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর একটা মন্তব্যে ঘরের মধ্যে যেন বোমা ফাটল।

ভদ্রমহোদয়রা, আমি যেটা চিন্তা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের কাজের জন্যে আরও স্ট্যামিনার প্রয়োজন।

ঠিক এই মুহূর্তে একজন সশস্ত্র প্রহরী ঢুকে ওকে একটা চিঠি দিতেই ও পড়ে হাওয়ার্ডের দিকে তাকালো। বলল, এতে লেখা আছে রাষ্ট্রদূত বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।ও একটা জরুরী সংকেত দেবে যা তোমাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রদূত? তার মানে তুমি বলতে চাইছে ও একজন দূত পাঠিয়েছে?

ফ্ল্যান্ড্রেস দৃঢ়ভাবে বলে উঠলো, রাষ্ট্রদূত নিজে। তুমি যখন এই মিটিং-এ উপস্থিত আছে তখন আমার ধারণা তোমার হাতেই ও সংকেতটা দেবে।

হাওয়ার্ড প্রহরীকে রাষ্ট্রদূতকে আনার জন্যে অনুরোধ করলো। খানিক বাদে সাদা গোঁফওলা, লম্বাটে একটা লোক হাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালো। রাষ্ট্রদূত স্যার হেনরী ক্রফোর্ড কাগজটা হাওয়ার্ডের হাতে দিয়ে বলল, এটা আমার হাতে এসেছে আমার ব্যক্তিগত কোডে অ্যান্টনীর মাধ্যমে। ব্যাপারটা আমি ছাড়া আর কেউ জানেনা। বিশেষ অনুরোধেই আমি নিজে এখানে এসেছি। অবশ্য তার পেছনে যুক্তিও আছে। পড়, পড়লেই বুঝতে পারবে।

ঘরের চারদিকে, সবার দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, তোমাদের সবাইকে দেখে আমি আনন্দ পেলাম। এখন যদি তোমরা আমাকে ক্ষমা করো...।

উঠে দাঁড়ানো অবস্থাতেই হাওয়ার্ড কাগজটা পড়তে লাগলো। তারপর সবার দিকে তাকালো। ওর অভিব্যক্তিতে কিছু বোঝা গেলনা। ইংরেজ ভদ্রলোক কোন আবেগ প্রকাশ না করে শান্তভাবে বলল, লন্ডন থেকে টুইড এই সংকেত পাঠিয়েছে। ও নিশ্চিত। সোর্সের অবশ্য কোন প্রমাণ ও দেয়নি। শুধুমাত্র এই পরিস্থিতিতে এটা তোমার কাছে পৌঁছে দেওয়া...।

ফ্ল্যান্ড্রেস বলল, যদি টুইড নিশ্চিত হয় তাহলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে ওর এরকম করার পেছনে কারণ আছে। সবচাইতে সিরিয়াস হল, এটা প্রকাশ পেলে সংবাদদাতার জীবন বিপন্ন...।

–ঠিক তাই। হাওয়ার্ড সতর্কভাবে বলল। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে সবারদিকে তাকিয়ে খবরটা পড়তে আরম্ভ করল–

বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে যে, একজন অজানা ঘাতক সামিট এক্সপ্রেসের চারজন ভি.. আই. পি-র একজনকে হত্যা করতে চেষ্টা করবে। চারজনের মধ্যে লক্ষ্যটা কার ওপরে তা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। টুইড।

***

৪. প্যারিসে বৈকালিক কনফারেন্স

ঊনত্রিশে মে, শুক্রবার :

পরেরদিন সকালবেলা। প্যারিসে বৈকালিক কনফারেন্সের জন্যে চারজন নিরাপত্তা প্রধান মিলিত হয়েছে। ঠিক তখনই মার্টেলের লঞ্চ কোনস্ট্যানজ লেকের পূর্বদিকে তীরভূমিতে একটা দুরুহ অবতরণের জায়গার দিকে এগিয়ে চলেছে।

উইন্ড সার্ফার এগজিকিউসান স্কোয়াডের প্রধান ওয়ার্নার হেগেন হাত পা বাঁধা অবস্থায় অসহায়ভাবে লঞ্চের নীচে পড়েছিল।

মুখটা বাঁধা। একটা কাপড় দিয়ে চোখ দুটোও বাঁধা। তা সত্ত্বেও ও ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল, মুখে সুর্যের উত্তাপ অনুভব করতে পারছিল।

মার্টেল প্রস্তুতি নিল। ক্লেয়ারও ওকে সাহায্য করছিল। কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সামনেই তীরভূমিতে পাথরের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সামনে ভাঙা কাঠের সিঁড়ি।

–শব্দটা বন্ধ করে দাও। ক্লেয়ার বলে উঠল, এ জায়গাটা আমি চিনি। এখানেই আমি মিউনিখ থেকে যখন ওয়ার্নার এসেছিল দেখা করেছিলাম। এ সামনের গাছগুলোর তলায় আগের রাতে একটা গাড়ি ভাড়া করে এসেছিলাম। ওখান থেকেই কাছাকাছি স্টেশনে গিয়ে লিন্ডা পৌঁছানো যায়।

–আমি তো গাড়ি...।

কি বলছো। ক্লেয়ার সামান্য কঠিন হয়ে বলল, জায়গাটা ঢালু, সমস্যাটা বুঝেছো তো মার্টেল?

বুঝেছি। সমস্যাটা যখন আমার...

–কিন্তু, আমরা কোথায় ড্রাইভ দেবো বুঝতে পারছি না।

–সেই সোনালী চুলের যুবকটাকে সেখানে অভিনন্দন জানাবো...।

-ওয়ার্নার হেগেনকে বয়ে নিয়ে এসে ও গাড়ির মেঝেতে ফেলে দিলো। জানলা দিয়ে বাইরের কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তারপর একটু বিশ্রাম নিতে লাগলো। দূরে একটা ওয়াটার মিলের ধ্বংসাবশেষ।

ক্লেয়ারের বর্ণনা মতে সবই ঠিকঠাক। এখানে মিলের উদ্দেশ্য কি কে জানে। কিন্তু বেশ কিছু ঘুরন্ত হুইল দেখা যাচ্ছে।

মার্টেল কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল, ব্লেডগুলো বেশ ধারালো।

–হুঁ, ও নিশ্চিত বলে উঠল, এটা কাজ করবে...।

—কি কাজ করবে?

–পুরোনো চীনা ওয়াটার টর্চার-এর আমার নতুন ব্যাখ্যা। সোনালী যুবক...।

ওরা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। জার্মানটাকে বয়ে নিয়ে আসতে দুজনকেই পরিশ্রম করতে হলো। আর এগোনোর আগে মার্টেল ক্লেয়ারকে মুখোশটা পরে নিতে বলল।

মুখোশটা পড়ে নিয়ে ক্লেয়ার মার্টেলের কাছে গেল সাহায্যের জন্যে। মার্টেল তখন প্লাটফরমের হুইলটার দিকে তাকিয়েছিল। হুইলের যে অংশটা ঘুরে যাচ্ছিল সেখানে হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে একটা ব্লেডের সঙ্গে আটকে দিলো। মাথাটা এমনভাবে রাখা হল জলের মধ্যে অর্ধেকটা রইল। দেহটা ওপরদিকে। কাজটা শেষ করতে লাগল দশ মিনিট। ওর বাঁধা চোখ দুটো খুলে দেওয়া হলে সামনে মার্টেলকে দেখে ওর চোখ বিস্ফারিত হল। ক্লেয়ারের আঙুলগুলো ওর মুখের ওপর।

মুখে মুখোশ পরে, মার্টেলের জ্যাকেট পরে, হাতে পিস্তল নিয়ে ক্লেয়ারকে নৃশংস খুনীর মতো লাগছিল।

এরপরে হুইলটা জলের নীচে চলে যেতে হেগেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই কঠিন পরীক্ষায়। উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

চাকাটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথাটাও ঘুরতে লাগলো। ও এবারে জ্ঞান হারাতে পারে।

মার্টেল নদীর তীরের দিকে এলো। হুইলটা একইভাবে ঘুরে চলেছে। আকাশটা ধূসর।

আমরা এখন কথা বলতে পারি। ও আস্তে আস্তে ডুবছে। মার্টেল বলল।

ডুবুক। কঠিন স্বরে বললো, মুখোশটা মুখ থেকে খুলে ফেলে বলল, চার্লসকে যারা নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল ও তাদেরই একজন...।

মার্টেল ওর দিকে তাকাতেই বলল, ওকে ছাড়বে কখন?

–যতক্ষণ না ওর প্রতিরোধ শক্তি ভেঙে যাচ্ছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ও সব কথা বলছে। আমার এখনও আশা অনেক কিছুই...।

এদিকে হেগেনের অবস্থা অচৈতন্যের পর্যায়ে এসে গেছে। ক্লেয়ার মুখোশ পরে নিলে তারপর দুজনে প্লাটফরমের দিকে চলল।

মার্টেল ওর পায়ের বাঁধন কেটে ওকে তীরে নিয়ে এল। আস্তে আস্তে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো। ক্লেয়ার বন্দুক তাক করে বসে।

খানিক বাদে মার্টেলের প্রশ্ন, তুমি কে বলতো?

রেইনহার্ড দিয়েত্রিচের ভাইপো...।

–তোমার নাম?

–ওয়ার্নার হেগেন। তুমি তো জানো...।

–আমার প্রশ্নের শুধু ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে যাও।

এরপর মার্টেল আবার জিজ্ঞেস করল, অপারেশন ক্রোকোডাইল ডেলটার দিন কবে ঠিক করা?

–তেসরা জুন। নির্বাচনের আগের দিন। ও থামল। আস্তে আস্তে ও ধাতস্থ হয়ে উঠছিল। ক্লেয়ার ওর দিকে পিস্তল তুলে ধরে রইল।

মার্টেলের দিকে তাকিয়ে হেগেন বলল, তুমি ওকে একটু থামাও। উত্তর তো দিচ্ছি। এই খারাপ ব্যাপারটা থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। কোথাও একটা গোলমাল...।

–তুমি বলছ তেসরা জুন। কিন্তু তুমি আরো কিছু...।

মার্টেলের কথার মাঝখানে হেগেন বলে উঠল, জায়গাটা হলো সামিট এক্সপ্রেস যখন ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করবে।

সবই আমরা জানি। মার্টেল বলল, ওয়ার্নার লন্ডনের খবর। মার্টেল সিগারেট টেনে বলল, আমি ব্যাপারটা তোমার কাছে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম।

হেগেন বিস্মিত হয়ে বললো, তুমি সব জানো?

–হ্যাঁ, আর যা জানো বলল। সামিট এক্সপ্রেসে কি ঘটবে?

–চারজন পশ্চিমী নেতার মধ্যে একজন খুন হবে।

মার্টেল নিস্পৃহ অভিব্যক্তিতে জিজ্ঞেস করল, লক্ষ্যটা কে?

লক্ষ্যটা কে সত্যিই জানিনা। ঈশ্বরই জানেন...।

হেগেন আতঙ্কে বলে উঠলে মার্টেল জিগ্যেস করল, তুমি এসব জানলে কিভাবে?

কারণ আমি দিয়েত্রিচের ভাইপো।

মার্টেল জিজ্ঞেস করল, তুমি আগে বলেছো কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে? কি সেই গণ্ডগোল?

–আমি নিশ্চিত নই।

-আমি কিন্তু জবাব চাই। কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল মার্টেল।

-আমার কাকা সম্ভবতঃ সামনের নির্বাচনে ব্যাভেরিয়াতে ফিরে আসছে। কারণ জনগণ আমাদের চায়। ওদের ভয় বলশেভিক উফলারকে।

ওর মুখের ভাব খানিকটা বিব্রত। আবার বললো, কিন্তু যত তাড়াতাড়িই মিলিশিয়াদের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক এসব করতে যাবো, বি.এ. ডি খুঁজে তা বের করত, সম্ভবতঃ কেউ খবর দিচ্ছে...।

মার্টেল জিজ্ঞেস করলো, ঐ নেতাকে কে খুন করবে?

হেগেন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল, তারপর বলল, আমি ঠিক জানিনা। তবে ওদের নিরাপত্তা প্রধানের চারজনের মধ্যে একজন...।

শুনেই মার্টেলের কেমন যেন মনে হচ্ছিল। স্বাভাবিক হয়ে সেই সুযোগে হেগেন ক্লেয়ারের মুখে সজোরে একটা ঘুষি মারতে ও ছিটকে পড়েও পিস্তলটা তাক করে রইল। লোকটাকে এখনও বাঁচিয়ে রাখা দরকার। এবারে ওর মাথাটা মিলটার দিকে এগিয়ে যেতে সজোরে একটা পাথরে ধাক্কা খেল। আর্তনাদ করে উঠলো। মিলের ধাতব ব্লেড ওর মাথার একপাশে লাগতেই ও নির্জীব হয়ে গেল। মাথাটা জলের ভেতর। রক্তে জল লাল হয়ে উঠল।

ক্লেয়ার হেগেনের কাছে গিয়ে মনযোগ দিয়ে পরীক্ষা করবার পর মার্টেলকে বলল, মারা গেছে। আমরা এখন কি করব?

–ওকে নিয়ে যেতে হবে। এখনই স্টোলার আর ডরনারের সঙ্গে দেখা করা দরকার। টুইডকে ফোন করতে হবে।

লিন্ডাউ পুলিশ স্টেশনে ওরা পৌঁছলো। বর্ষাতি ঢাকা দেওয়া মৃতদেহটা গাড়ির পেছনে।

ডরনার জানালো, এরিখ স্টোলার তোমাকে একটা খবর জানাতে বলেছে। নিরাপত্তা বিষয়ক কনফারেন্সে ও প্যারিসে গেছে। আমি হেগেনের ব্যাপারে সমস্ত কিছু করবো। ওকে মিউনিখ মর্গে নিয়ে যেতে বলেছে। লন্ডনে ফোনের ব্যাপারে...।

ডরনার ওদের গাড়িতে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। জার্মান ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলো। ওদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা ওরই হাতে।

ডরনারের কথামতো লন্ডনে ফোন করল। টুইডের কণ্ঠস্বর শুনে মার্টেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিছু বলার আগেই টুইড প্রাথমিক ব্যাপারগুলো সেরে নিলো।

...অপারেশন ক্রোকোডাইল। কেইথ, তুমি ঠিক এখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ জার্মানীর ম্যাপটা দেখ। কেপকোন্ট্যানজকে ভাল করে লক্ষ্য করো, দেখবে জায়গাটা কুমীরের মতো...তাইনা?

-হ্যাঁ। ঠিক। ব্যাভেরিয়াই কর্মকাণ্ডের উৎসস্থল। রেইনহার্ডের ভাইপো হেগেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অবশ্য ও এখন শেষ।

চারজন ভি. আই. পির একজন খুন হবে সামিট এক্সপ্রেসের মধ্যে। সব ঠিকঠাক। শুনতে পাচ্ছো।

–হুঁ। ওদের নাম্বার দাও। ফোন নাম্বার, লক্ষ্য বস্তু...।

–সেই ইনফরমার তা বলতে পারেনি।

যাই হোক, আমাদের সাবধান হতে হবে। এ ব্যাপারটা আমি পেয়েছি। খুনির পরিচয়? মার্টেল ওর প্রশ্নে থতমত খেলো। টুইড ওর সম্পর্কে কি ভাবছে? ডরনার সুইচ বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে, সুতরাং শোনার মত কেউ নেই।

ব্যাপারটা আমি বুঝেছি। হেগেনের খবর ঠিকই। আমার জাজমেন্টকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

–আচ্ছা।

-হ্যাঁ, চারজন সিকিউরিটির একজন সম্ভবতঃ খুনী। ভি. আই. পি-দের ওরাই গার্ড দেবে। কিন্তু না...।

–ঠিক আছে।

–আমার বিচারকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

–আচ্ছা।

টুইডের কাজ সময়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে চলে। এরপরে ও ক্যাবে চড়ে পার্ক ক্রিসেন্টে যাওয়ার উদ্যোগ করতে লাগল। এদিকে উচ্চাকাঙ্খী মনোভাবের হাওয়ার্ড সিকিউরিটি মিটিং কোথায় হচ্ছে কাউকে কিছু না বলে প্যারিসে চলে গেছে। হাওয়ার্ড চারজনের মধ্যে একজন। সুতরাং সন্দেহ...।

নাঃ, টুইড সমস্ত নিয়মনীতি মেনেই কাজ করে। ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হেনরীক্র্যাফোর্ড-এর সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু ফরেন অফিসে বন্ধুকেই আগে ফোন করা দরকার।

খুব জরুরী। টুইড বলল, আমি একটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছি। দু-ঘণ্টার মধ্যে ওটা রাষ্ট্রদূতের কাছে অবশ্যই পৌঁছবে।

–অ্যামবাসীতে ফোন করে আগে জেনে নাও ও আছে কি নেই। ও সঙ্গে সঙ্গে অ্যামবাসীতে ফোন করলো। রাষ্ট্রদূত অফিসেই ছিল। জানালো কোনরকম সমস্যা নেই। সিগন্যালটা আসা অবধি ওর নিশ্চয়ইক্র্যাফোর্ডকে সহানুভূতিশীল মনে হলো। টুইড ফরেন অফিসে যোগাযোগ করার জন্যে ক্যাবে গিয়ে ঢুকল।

–আমি স্যার ক্র্যাফোর্ড-এর সঙ্গে কথা বলেছি। আরাম চেয়ারে বসতে বসতে ও বলে উঠলো ঘরের মধ্যে অন্য একজন জিজ্ঞেস করল, কিন্তু খবরটা কি?

–ঠিক হয়েছে ডিউটি থেকে অপদার্থ ক্লার্কটিকে বিছিন্ন করতে হবে। তুমি কিছু মনে করবেনা নিশ্চয়ই।

টুইড বিনীতভাবে ঢুকতে গেলো। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।বাইরে থেকে ঢুকলে সে প্রাইভেট ফোর্ড ব্যবহার করে। টুইড একেবারে নিশ্চুপ। চশমাটা ঠিক করতে লাগলো আর এগোতে লাগল।

–আমার সঙ্গে এসো। বলে উঠল।

দশ মিনিট পরে সিগন্যাল প্যারিসে যাত্রা করল। এবারে টুইডের পার্ক ক্রিসেন্টে যাওয়া দরকার। ক্যাবে উঠে বসলো।

দিনটা অত্যন্ত বর্ণময়। রাষ্ট্রদূত নিজেও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এরপর রাষ্ট্রদূত নিজে কনফারেন্স রুমে হাওয়ার্ডকে খবরটা জানাবার উদ্যোগ নিলো। এর পরে হাওয়ার্ড তিনজন সিকিউরিটি চীফকে খবরটা জানাতে বাধ্য হবে।

–আমার ধারণা আমি যদি থাকতাম তাহলে, খবর পড়ার সময় ওদের অভিব্যক্তি দেখতে পেতাম।

চ্যারিং ক্রস রোডে ঢোকার মুখে, টুইড বলে উঠল, একজনের অভিব্যক্তি নিশ্চয়ই বদলে যেতো।

চারজনের মধ্যে যে কোন একজন...।

টুইড ম্যাকনেইলকে সবকিছু বুঝিয়ে বলল। ওরা দুজন রিজেন্ট পার্কে ঢুকছে। জায়গাটা আলোকিত। টুইডের পায়ের নীচে ঘাস। সবকিছু ঠিকঠাক, এখন সমস্যা সময়ের। এটার সমাধান করতেই হবে।

–ও'মিয়েরা, স্টোলার, আর ফ্ল্যান্ড্রেস।

--হাওয়ার্ডের কথাটা ভুলে যেওনা।

–আমি ঠিক খুঁজছি? ম্যাকনেইল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো।

একটা গ্যাপ। টুইড একটা সবুজ গাছের নীচে থামল।

জীবনের গ্যাপ রেকর্ড চারজন বিশ্বস্ত লোকের মধ্যে একজন। ও নিশ্চয়ই লোহার পর্দার আড়ালে চলে যাবে। আমি নিশ্চিত, অনেকদিন আগে থেকেই লোকটা...।

–হাওয়ার্ডের ব্যাপারটা একবার পরখ...।

-তোমার একটা কাজ আছে। সেন্ট্রাল রেজিস্টার ফাইলগুলো দেখবার একটা যুক্তি দেখাতে হবে। আমি চিন্তা করছি...।

হঠাৎ টুইডের মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললো, ম্যাকনেইল মজার ব্যাপার। একটা কু পাওয়া গেছে। যদি...।

–হাওয়ার্ড-এর থেকে টিম ও'মিয়েরা কোন অংশে কমনয়। এক বছরই কেবল ও প্রেসিডেন্ট সিক্রেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিল।

সেজন্য আমাকে ওয়াশিংটন যেতে হবে, যদি সীট পাই। আমি জানি ওখানে কেউ আমাকে সাহায্য করবে না। ও ও'মিয়েরাকে পছন্দ করেনা। একটা ছোট ব্যাপার অনেক সময় দরজা খুলে দেয়।

–হাওয়ার্ড জানতে চাইবে, ও সতর্ক করে দিলো। এছাড়াও কনফোর্ড-এর টিকিট-এর খরচের ব্যাপারটা হিসাবে থাকবে।

না, না হবেনা। আমার নিজের পয়সা দিয়েই টিকিট কিনেছি। আমার কাকার কিছু সম্পত্তি আছে। হাওয়ার্ড ফিরে আসার আগেই আমার কাজ হয়ে যাবে। ওকে বলবে আমার হাঁপানিটা : বেড়েছে। সেজন্যে আমি ডেভেন কটেজে গেছি।

ও চেষ্ট করবে যোগাযোগের..। কিন্তু, আমবাসাডারের পাঠানো সিগন্যাল টুইড ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। চারিদিকে তাকিয়ে তারপর বলল, আমার কোন সন্দেহ নেই যখন ও ফিরে আসবে, তখন ওর প্রথম কাজের ব্যাপারটা আমার অফিসে পৌঁছে গেছে। কটেজের ব্যাপারটা আসলে ধোঁকা।

কথা শেষ হলে ওর অভিব্যক্তিটা কেমন কঠিন লাগলো। বললো আবার, ও ভাববে হয়ত, কয়েকদিনের জন্যে ওকে আমি পাশ কাটাচ্ছি। কিন্তু ও মোটেই ভাববে না যে, আমি অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে কোথাও গেছি।

ম্যাকনেইল সামনের দিকে তাকালো।

ঘুরে তাকিও না। ম্যাসন আমাদের ঠিক পেছনে। সঙ্গে আবার একটা কুকুর...।

টুইড চশমাটা খুললো। পরিষ্কার করে লোকটাকে একবার দেখল। ওর চশমার কাঁচে ভেসে উঠল পাতলা ডেপুটির প্রতিমূর্তি যাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে সম্প্রতি নিয়োগ করা হয়েছে। একটা গাছের তলায় ও থামলো।

–আমি তো কুকুরের চেয়ে মানুষ বেশি পছন্দ করি। টুইড চশমাটা পড়ে নিয়ে সামনের দিকে এগোলো। বললো, লিস্টে ওর নামটাও সোজা করো। যদি কেউ গুরুত্বপূর্ণ গরমিল খুঁজে পায়, তাহলে তুমি...।

মাঝপথেই থেমে গেল ও।

রাতের জন্য একটা ঘর রিজার্ভ করে রেখেছে। হোটেলটা বড়ই। ফ্রান্সের অভিজাত হোটেলই বলা যায়। অতিথিদের জন্যে ও অপেক্ষা করছে। পার্ক ক্রিসেন্টে একটা কল করলো।নাইট ডিউটির অপারেটরটা ছিল।

টুইডের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই, একটু আবেগের সঙ্গে ও বললো।

–এক মিনিট স্যার। আমি একেবারে ওর অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে নিচ্ছি।

হাওয়ার্ড ঘড়িটা একবার দেখল। দশটা পঁয়তাল্লিশ। ও নিজেও খানিকটা ডিসটার্বড়।টুইড পার্ক ক্রিসেন্টের মধ্যে রয়েছে। বিল্ডিং একেবারেই ফাঁকা। ফোন করবার পরেই ব্যাপারটা ও অনুভব করতে পারলো। তারপরেই ও প্রান্ত থেকে ম্যাকনেইলের কণ্ঠস্বর শুনে ও সতর্ক করে দিলো এটা প্রকাশ্য ফোন।

–আমি আমার হোটেলের ঘর থেকে ফোন করছি। টুইডের সঙ্গে আমার জরুরী দরকার...।

–আমি বলতে ভয় পাচ্ছি যে টুইড ভীষণ অসুস্থ। অবশ্য এমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়। হাঁপানির আক্রমণ। কয়েকদিনের জন্য ও একটু দেশে গেছে।

–তাহলে ওকে ফোনে পাওয়া সম্ভব নয়?

–এখন হবেনা বলেই মনে হচ্ছে। আবার কখন পাওয়া যাবে তোমাকে?

বলা মুস্কিল। আচ্ছা শুভরাত্রি। কঠিন মুখে ফোনটা রেখে বিছানায় বসে রইল চুপচাপ খানিকক্ষণ। ওর ভবিষ্যতের গতিবিধি আগে থাকতে জানানো ওর ভীষণ অপছন্দ।

এদিকে পার্ক ক্রিসেন্ট অফিসে ফোনটা রেখেই মিস ম্যাকনেইল নিজের মনেই মৃদু হাসল। একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত যে শেষ প্রশ্নটা করবার আগেই হাওয়ার্ড লাইনটা ছেড়ে দিয়েছিল। ওর সামনে রাখা ডোসিয়ারটা পরীক্ষার জন্যে আবার ফিরে এলো। ওটার মধ্যে একটা লাল তারা রয়েছে। ক্লারিফিকেশানটা সত্যিই উঁচুদরের। কভারের ওপর নামটা লেখা আছে। ফ্রেডেরিক অ্যান্টনী হাওয়ার্ড।

ওদিকে প্যারিসে হাওয়ার্ড অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিল। মাঝে মাঝেই ঘরের দরজায় কে যেন টোকা মারছে। টোকার সংকেত দেখেই বুঝতে পারছে, ও অ্যালেন ফ্ল্যান্ডেস। সিগন্যালের উত্তরে ফ্ল্যান্ড্রেস ওকে যে ৭.৬৫ এম, এম.-এর যে পিস্তলটা ব্যবহার করতে দিয়েছিল সেটা বের করে পকেটে গুঁজে রাখলো। তারপর দরজা খুলতেই কোডে একটা কথা বলে উঠল।

ও ঘরের মধ্যে ঢুকে কথা বলে খানিকটা মৃদু হাসলো। ওর কালো তীক্ষ্ণ চোখ ঘরের সর্বত্রই ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

-কে চেজ? হাওয়ার্ড জানতে চাইল।

–বেনেয়ট। ওরা প্যারিসের সমস্ত জায়গাতেই ভাল খাবার পরিবেশন করে। শেষ পরিবেশন ছিল রাত নটায়। কিন্তু আমার ব্যাপারে লে প্যাট্রন ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। ওখানে অবশ্য পুলিশ আছে। তুমি প্রস্তুত। ভাল...।

ফ্ল্যান্ড্রেস বলে উঠল, লন্ডন থেকে আমি টেলেক্স করেছিলাম। কার্লোসকে সকালে পিকাডিলীতে দেখা গেছে যে ব্যাপারে তুমি বিরক্ত হয়েছিলে? তুমি অবাক নয়? কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে? সকালে তুমি লন্ডনে ছিলে তো?

এরপর ওরা পরস্পর টেলেক্স এর ব্যাপারে আলোচনা করলো। এখন ও মোটামুটি বুঝেছে যে কিছু একটা ব্যাপার ইংরেজটাকে বিব্রত করছে। কোথাও যেন একটা গোপনীয়তা...।

***

শনিবার, তিরিশে মে :

ওয়াশিংটন ডিসি, ক্লিন্ট লুমিস... ওয়ার্নারের মৃতদেহের পোষাক থেকে যে নোটবুক পাওয়া গেছে তাতে আর বেশি এগোনো যায়না।

কনকেডি যখন সঠিক সময়ে ডালাস বিমান বন্দরে নামলো তখন টুইড জনতার মাঝখান দিয়ে নামতে লাগল। চশমাটা খোলা অবস্থায় মুখটা অনেকটাই বদলে গেছে।

টুইড ক্লিন্ট লুমিসকে নিয়ে সোজা একটা নীলচে সেডানে উঠে বসলো। লুমিস সবদিক দিয়েই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

রোদ ঝলমলে দিন। কিছু মামুলি কথাবার্তার পর লুমিস বললো, তুমি ওকে রিপোর্টটা দেবে, সে যাতে বোঝে তুমি কাজটা করে যাচ্ছো। লুমিস খানিক বাদে আবার বলে উঠল, বিমানবন্দরে আমাদের কেউ অনুসরণ করেনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। লুমিসের অনেক কিছু ব্যাপার টুইডের ভাল লাগে। সবেগে চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে সমস্ত কিছু দেখতে দেখতে টুইড বলে উঠলো, আমাদের পেছনে একটা সবুজ গাড়ি আসছে। আমরা কি...।

লুমিস দেখে নিল তার পেছনে দুটো গাড়ি। ডালাস থেকেই গাড়ি দুটো ওদের পেছনে আসছে। লুমিস খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়লে টুইডই ওকে সাহস দিলো। খানিকটা বাদেই ট্রাকটা হুড়মুড়িয়ে প্রায় ওদের ওপরে এসে পড়লো। লুমিস চীৎকার করে উঠলো। আলো...।

রাবারের একটা আর্তনাদ। টুইড ততক্ষণে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। আলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আবার দ্বিতীয় আর্তনাদ। এয়ার ব্রেক জ্যাম হয়ে গেছে।

আমরা প্রায় মারা পড়েছিলাম।

টুইড আয়না দিয়ে দেখল গাড়ি এগোচ্ছে। আর কোন বাধা আপাততঃ নেই।

মিটিং এর জায়গাটা অদ্ভুত। পটোম্যাক নদীর ওপরে বয়াতে বাঁধা একটা পাওয়ার ক্রুজার। টুইড প্রথমে সাইনপোস্ট দেখে পরে লুমিসের সহযোগিতায় রাস্তার পূর্বদিক ধরে এগোচ্ছিল। অবশেষে পৌঁছানোর পর ওকে নদীবক্ষে যেতে হবে।

-ওটা তোমার নাকি? ক্রুজারটার দিকে আঙুল দেখিয়ে টুইড জিজ্ঞেস করল।

–হুঁ, ওটা আমার নিরাপত্তা বলতে পারো...।

টুইড আশ্চর্য হয়ে ভাবল ওয়াশিংটনে ওর সদর দপ্তরেই অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে। ক্লিন্ট লুমিস সি. আই. এর অবসরপ্রাপ্ত। তবুও যেন কেমন নার্ভাস-প্রকৃতির। একটা বিচিত্র নৌকোয় চেপে ক্রুজারের দিকে দুজনে এগিয়ে চললো। ক্রুজারে একটা কুকুর আছে। কোন অনুপ্রবেশকারীকেই রেয়াৎ করে না। টুইড জিগ্যেস করল, এই কুকুরটা?

–ও নদীতে সাঁতার কাটতে পারে। লুমিসের মুখে বেশ স্বস্তির ভাব। বসার পর ও আবার বলতে শুরু করল, ওয়াডলো বিস্ফোরকের ব্যাপারে অভিজ্ঞ। যে কারণে ওকে আমরা ডেকে দেখতে যাই। কোন অনুপ্রবেশকারীই ক্রুজারে থাকতে পারেনা। ওয়াডলো মারা যেতে পারে কিংবা কোনো লোকের দেহ পড়ে থাকতে পারে যার গলাটা ফালা ফালা হয়ে গেছে। ঠিক আছে?

টুইড একটু ভয়ে শিউরে উঠে খানিকটা বিয়ার গলাধঃকরণ করলো আর কম্পিত স্বরে বললো, ঠিক আছে।

কথা প্রসঙ্গে টিম, ও'মিয়েরার কথা উঠল। ও বলল, ঐ টিম যখন অপারেশন ডিরেক্টর ছিল তখন আমাকে ও কোম্পানী থেকে বের করে দিয়ে সিক্রেট সার্ভিসের বস হয়ে বসে।

–কিন্তু মিয়েরা এরকম কেন করেছিল?

কারণ, আমি জানি আফগানিস্তানের অস্ত্রশস্ত্রের বরাদ্দ বাবদ দুশো হাজার ডলার ও আত্মসাৎ করেছিল।

মিউনিকের অ্যাপার্টমেন্টে ম্যানফ্রেড একটা পরবর্তী কালের ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছিল। কথাবার্তা প্রথমটা সবই কোডে হয়। কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, টুইড জানে যে লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট।

–লক্ষ্যবস্তু কি ও চিনতে পেরেছে?

ম্যানফ্রেড বিব্রত গলায় জিজ্ঞেস করল।

কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, না, একমাত্র একজনই। তুমি নিশ্চয়ই অ্যাকশন নিতে পারো।

–জানাবার জন্যে ধন্যবাদ। আমাকে আবার আগামীকাল এইসময়ে ফোন কারো। ম্যানফ্রেড রিসিভার রেখে দিয়ে ভাবল, যে ওর সঙ্গে কথা বলেছে তার কণ্ঠস্বরে কোন অস্বস্তি ছিলনা। একটা নোটবুক খুলে লন্ডনের একটা নাম্বারে ও ডায়াল ঘোরাল।

টুইড-এর ওয়াশিংটনে যাবার আগের দিন উপরোক্ত ঘটনা ঘটলো। ঐদিনই সন্ধ্যেবেলা চারজন নিরাপত্তা প্রধান প্যারিসের মুরেট বিল্ডিং-এ একটা কনফারেন্সে মিলিত হলো।

***

টুইড-এর মনে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছিল। ও একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলোনা যে, ক্লিস্ট লুমিসের মানসিক রোগ আছে কিনা, তা না হলে ও সর্বত্রই ওর শত্রু দেখছে!

ওর আরো একটা কথা মনে পড়ল, ডালাস বিমানবন্দরে আসার সময় দুটো গাড়িতে চারজন ওদের অনুসরণ করেছিল।

চার্লস ওয়ার্নার সপ্তাহ দুয়েক আগে আমার কাছে এসেছিল ও'মিয়েরার ব্যাপারে ও খুবই আগ্রহী। তুমি স্টেশনে এসেছ আমার সঙ্গে কথা বলতে? ব্যাপারটা একেবারেই বিশ্বাস হচ্ছেনা।

বিশ্বাস কর, যখন ও'মিয়েরা সি. আই. এ-র অপারেশান ডিরেকটর ছিল তখন তোমার অবসরের ব্যাপারটা ঐ দেখেছিল। একটু নরম ভঙ্গীতে টুইড বলল।

একটু থেমে আবার বলল, ল্যাংলেতে ডিউটি করার পর ও পশ্চিম বার্লিনে বেশ কবছর ছিল? সত্যি?

–ঠিকই বলেছে। কিন্তু টুইড...।

–আমাকে বিশ্বাস করো। ও ওর কণ্ঠস্বরকে যথাসময়ে নরম করে লুমিসকে বোঝানোর বা একটা ব্যাপার মনোনিবেশ করানোর চেষ্টা করছিল।

-তুমি বলছো ওর পশ্চিম বার্লিনের রেকর্ড তুমি পরীক্ষা করে দেখেছে। ও জার্মান বলতে পারে?

-খুব ভাল বলতে পারে।

লুমিসের মাধ্যমে টুইড জানতে পারলো ও'মিয়েরা ছদ্মবেশে পূর্ব বার্লিনে লু কারসন নামে এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। টুইড কথার ফাঁকে লুমিসের দিকে একইভাবে তাকিয়ে ছিল। লুমিস একবার বলে উঠলো, শয়তানটা আমাকে মোটেই পছন্দ করেনা।

টুইড শান্তভাবে বসে রইল, লুমিস উঠে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। শান্ত-জলরাশির ওপর দিয়ে ধীরগতিতে নৌকো এগিয়ে চলেছে।

লুমিস আবার কথা বলা শুরু করল, পশ্চিম বার্লিনের এই বিশেষ ইউনিটের ঐ দুজন পূর্ব জার্মানীর এসপিয়নেজ সেটআপের ওপরে নজর রেখেছিল। কার্লোস-এর রিপোর্টেই ব্যাপারটা জানা যায়।

-তাই নাকি?

আমাদের কোড চেনার একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল। সে ভাবেই জানতাম লু কারসনের মাধ্যমে ও'মিয়েরার সংকেত আসে।

টুইডের চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক রহস্যময় জাল...।

পরের দিন ঠিক সময়েই ম্যানফ্রেড দ্বিতীয় বারের লং-ডিসট্যান্স ফোন করলো। ম্যানফ্রেডই কথা বলা আরম্ভ করলো, ভাববার কিছু নেই। টুইড ওয়াশিংটনেই আছে।

শয়তান। তুমি কেমন করে জানলে?

–আমার লোক সবজায়গাতেই আছে। যাই হোক সমস্যা একটাই। কাজের ব্যাপার।

–তুমি কি টুইডের সঙ্গে যোগাযোগ...।

না। তাহলে ব্যাপারটা ভেস্তে যাবে। ক্রোকোডাইল ঠিক সময় এগোবে। আমি...।

ম্যানফ্রেড নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগল। ভাবল, টুইডকে হত্যা করার কাজটা ভীষণ শক্ত। কোথায় যেন লোকটার একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর ও ওয়াশিংটনে যোগাযোগের জন্যে ফোনটা আবার তুলে নিল।

***

একত্রিশে মে, রবিবার

টুইড সারা রাত ওয়েসিস-এ কাটালো। লুমিসকে বেশ খানিকটা নার্ভাস বলে মনে হচ্ছিল।

লুমিস ক্রুজারটাকে বয়াতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, একভাবে অনেকদিন এক জায়গায় থাকা নিরাপদ নয়। রাতের অন্ধকারে সব সময় সঙ্গে কোন আলো ছাড়া ঘোরাফেরা করবে।

ব্যাপারটা বেআইনী নয়? নৌকোয় কোন আলো নেই? টুইড জানতে চাইলো।

জীবন মরণের প্রশ্নে...।

এরপরে ওরা পুরানো কিছু কথাবার্তায় ফিরে গেল। ডালাসে পৌঁছবার পরে টুইডের লক্ষণীয় দুটো ঘটনা ঘটেছে।

ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। ডেকে সুটকেশ হাতে ও দাঁড়িয়েছিল। আস্তে আস্তে চলেছে ওটা।

লুমিসকে একবার বললো ও, তোমার ফিল্ড গ্লাসটা আমাকে একবার দাও তো।

লুমিস দিতে টুইড ওটা চোখে লাগিয়ে ফোকাসটা ঠিকমত এ্যাডজাস্ট করে তট রেখার দিকে তাকালো। তারপর লুমিসকে ওটা দিয়ে দিল।

লুমিস জিজ্ঞেস করলো, কেউ নজর রাখছে?

–গাছের ওপর দুজন। একজনের হাতে টেলিলেন্স ক্যামেরা...।

তখন ওরা দুজনে ডিঙিতে নামলো। সিঁড়ির ওপর কুকুর ওয়ালডো দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেই সময়ে একটা হেলিকপ্টার চেসাসিক বে থেকে চ্যানেলের মাঝামাঝি উড়ে আসছে। ওটা যেই অতিক্রম করে গেল, টুইড গলাটা বাড়িয়ে দিল যাতে মেশিনটা দেখা যায়।

লুমিস ডিঙিটাকে তটরেখার দিকে নিয়ে চলেছে। টুইড একভাবে হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়েছিল। সূর্যের আলোর ঝলকানিতে হেলিকপ্টারের কেবিনটা একেবারেই দেখা যাচ্ছিল না।

ডালাসে টুইড গাড়ি থেকে নেমেই সোজা বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢুকে গেল। লুমিস গাড়ি নিয়ে ফিরে যেতে, টুইডের লুমিসের মুখে শোনা ও'মিয়েরার কার্যকলাপের কথা মনে পড়ছিল।

খানিক বাদে টুইড চোখ বুঝল, কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল জানে না।

পার্ক ক্রিসেন্টে অবশেষে যখন টুইড পৌঁছালো, ম্যাকনেইলের চোখ দেখেই বুঝল গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে।

***

একত্রিশে মে, রবিবার

ডালাসে একা ফিরে আসার পথে ক্লিন্ট লুমিস অনেক জায়গায় গাড়িটাকে থামিয়েছিল। সমুদ্র উপকূলের সব কিছু ওর জানা।

রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। মিস ডিঙিতে উঠে মোটরে স্টার্ট দিলো। সামনেই ক্রুজার ওয়েসিস দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ হেলিকপ্টারের আওয়াজে ওর টুইডের কথা মনে পড়ল।

ওয়াডলো লুমিসকে দেখে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে একবার চীৎকার করে উঠলো।

লুইস ডিঙিটা বেঁধে ক্রুজারে উঠতে যাবে ঠিক সেই সময়ে ওর লক্ষ্য পড়ল ঠিক একই রকমের আর একটা ক্রুজার ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

ও সতর্ক হবার চেষ্টা করল।

ওয়াডলো কেমন অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে গরগর শব্দ করতে আরম্ভ করলো।

–কি ব্যাপার ওয়াডলো...?

বলেই ওয়াডলো যেদিকে তাকিয়ে ছিল লুমিসও সেদিকে তাকালো। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর অভিব্যক্তির পরিবর্তন হলো। ক্রুজারটা সম্ভবতঃ ওদের পাশ দিয়েই বেরিয়ে যাবে কিন্তু লুমিস ওটার ডেকের ওপরে কাউকে দেখতে না পেয়ে দ্রুত কেবিনের দিকে দৌড়লো।

সি. আই. এর প্রাক্তন লোক হিসেবে ও একটা ছোট অস্ত্রাগার ভরে রেখেছে। সেটা খুললল, একটা মেশিন পিস্তল দেখতে পেলো। ডাবল ব্যারেলের শর্টগান আর তিনটে হ্যান্ডগানও আছে। ও শর্টগানটা বের করলো।

ক্রুজারটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল। লুমিস ওটা নিয়ে ডেকে দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভবতঃ হুইলের কাছে কেউ যেন বসে আছে। ও ক্রুজারের গায়ে ওয়েসিসনামটা একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলো।

ওয়াডলো তখনও মুখ দিয়ে গরগর করে যাচ্ছে। চারিদিকে শুধুই জল ছাড়া কিছুই চোখে পড়েনা।

ও একটু নীচু হল, শর্টগানটা চোখের আড়ালে। যদি ওদিক থেকে কেউ কিছু ছেড়ে তাহলে ও সমস্যায় পড়বে। আবার এটাও হতে পারে হয়ত স্বাভাবিকভাবেই ক্রুজারটা পাশ দিয়ে চলে যেতে পারে।

ও কি সজোরে চীৎকার করে জানতে চাইবে?

ও খানিকটা হিংস্র হয়ে পড়লো। সামনে ওয়াডলো রয়েছে।

লুমিস আগে দেখতে পায়নি, একটা টাস্ক পুরোপুরি তৈরী। ক্রুজারটা ওয়েসিসের একেবারে কাছাকাছি। ডেকের ওপর গ্রেনেড ও মিসাইলগুলো ঠিক জায়গায় ফিট করা আছে।

–হে যীশু...।

তারপরেই একজন একেবারে ওয়াডলোর কাছে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার মাংসগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

লুমিস এই দেখে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, শুয়োরের বাচ্চা।

বলে শটগান সামনের দিকে ধরে ট্রিগার টিপতে যাবে ঠিক সেই সময়ে একটা গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো। পেছনের পাটা ওর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অতিকষ্টে নামতে গিয়ে ঠিক সেই সময়ে আরো একটা গ্রেনেড এসে কেবিনের সামনে পড়ল। কেবিনটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। লুমিসের অবস্থা আরো শোচনীয় বলা যায় দেহটা একেবারে ছিন্নভিন্ন।

এরকম পরপর দশটা বিস্ফোরণ ঘটলো। তারপর একটা হুক দিয়ে ওয়েসিসকে আটকালো। প্রত্যেকের গায়েই ফগম্যান স্যুট। একজনের হাতে সাব মেশিনগান।

এদিকে একটা লোক কয়েকমিনিট জাহাজটা সার্চ করল। ভেতরে কেউ নেই। লুমিস তখন মৃত। ও নিশ্চিত হয়ে আবার ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলো।

ওপরে তখন একটা হেলিকপ্টারের পাইলট রেডিওতে বলে যাচ্ছিল, শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

হেলিকপ্টারের গন্তব্য ওয়াশিংটনের দিকে।

***

একত্রিশে মে, রবিবার

বি. এন. ডি-র হেড কোয়ার্টার যেটা জার্মান ফেডারাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস আবিষ্কার করেছে সেটা হচ্ছে পূলাখ। জায়গাটা মিউনিক থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে। এরিখ স্টোলারের নার্ভ সেন্টার এর চারপাশে গাছ দিয়ে ঘেরা। ভেতরের দেওয়ালে বৈদ্যুতিক বেড়া লাগানো। স্টোলার রসিকতা করে বার্লিনের দেওয়াল নাম দিয়েছে। এই মুহূর্তে মার্টেলের সঙ্গে বসে ও কফি খাচ্ছিল।

টুইড লন্ডনে ফিরে আসার জন্যে একটা পাঁচের ফ্লাইট ধরলো।

স্টোলারের অফিসের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ হলো মার্টেল আছে। বাইরে সশস্ত্র প্রহরী।

–আমি চার বছর ওয়াইস বাডেনে ছিলাম। তারপর বি. এন. ডি-তে এসেছি। এক সময় আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম পূর্ব জার্মানীতে। স্টোলার জানালো, তারপর ব্যাভেরিয়াতে বছর কয়েক হল বসবাস করছে। এরই মধ্যে নয়া-নাজী আর বামপন্থীদের মধ্যেকার লড়াই শোচনীয় আকার ধারণ করেছে।

মার্টেল জানালো, স্টেটের নির্বাচন হলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে।

স্টোলার বলল, যদি ল্যাংগারের মডারেট পার্টি জেতে তাহলে হয়ত মিটবে। সমস্যা আসলে দিয়েত্রিচের পার্টি এবং ডেলটার অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার। এর ফলেইটফলার-এর বামদল জিতে যেতে পারে। ও তো আবার ব্যাভেরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র করার পক্ষপাতী। ফেডারাল রিপাবলিক থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

এরকম আলোচনা হতে থাকল ওদের দুজনের মধ্যে।

এরপরে সামিট এক্সপ্রেসের কথা উঠল। ওতে পাশ্চাত্যের সব বড় নেতারা থাকছে। স্টোলারের দায়িত্ব হচ্ছে স্ট্যালবার্গ থেকে সলিজবার্গ। স্টোলার মার্টেলকে বলে উঠল, মিউনিখে যাবার সময় ক্লেয়ার হফারকে পাওয়া যাবে কিনা। এরকম আলোচনায় কিছুক্ষণ কাটলো।

একসময়ে পার্ক ক্রিসেন্টের নাম্বারে ডায়াল করলো। খানিক বাদে ওপ্রান্তে ম্যাকনেইলের গলা শোনা গেল। ও ওকে চার প্রধানের ছবি দেবার কথা বললো।

ও প্রান্তে ম্যাকনেইল বলে উঠল,টুইড এখন বাইরে।ও একটা খবর দিতে বলেছে। আগামীকাল প্রথম ফ্লাইটে ওকে নাকি হিথরো বিমানবন্দরে যেতে বলেছে।

মার্টেলের কাছে ও ফ্লাইট নাম্বার চাইল। মিস্হফারের একটা পাসপোর্ট ছবি দিয়ে ওকে বললো তাড়াতাড়ি ব্যাভেরিয়াতে যেতে।

***

প্যারিসের এক উষ্ণ রবিবার। হাওয়ার্ড সামিট এক্সপ্রেসের ব্যাপার নিয়ে অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস আর ও'মিয়েরার সাথে আরো কিছু আলোচনার জন্য অপেক্ষা করছিল। নিরাপত্তার ব্যাপারটা আরো জোরদার করা দরকার। গেয়াফে ইস্ট থেকে ট্রেন ছাড়বে জুনের দুতারিখে। আর মাত্র তিন দিন বাকি আছে।

আলোচনার শেষে হাওয়ার্ড লন্ডনের ফ্লাইট ধরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় জানতে পারলো ও'মিয়েরাও লন্ডনে যাবে। খানিকক্ষণ থেকে ও কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। সামনেই কেতাদুরস্ত এক মহিলা কাগজ পড়ছিল। বাইরে যেতেই ফ্ল্যান্ড্রেস ওকে পথ দেখিয়ে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। গাড়িতে ঢুকতেই ও'মিয়েরাকে মনে পড়ল। বুঝল হাওয়ার্ডকে এখানে বাধ্য করে আনা হয়েছে। গাড়ি ছাড়তেই সেই মহিলাও পেছনে একটা ক্যাবে চড়ে বসলো।

সবাই নিশ্চুপ। হাওয়ার্ড দেখলো অ্যালেন হুইলের পেছনেই বসে আছে। চোখের সামনের আয়নায় দেখতে পেল কেউ ওদের অনুসরণ করছে। দ্যাগলে এসে অ্যালেন ওকে বিদায়

জানালো। হাওয়ার্ড চারদিকে তাকাতেই দেখল অদূরেই দুজন তোক তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে সুটকেশ হাতে সেই মহিলা দ্রুত চলে গেল।

কোথাও যেন কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

***

মিউনিখের হাউপ্টব্যানহফ। ব্যাভেরিয়ার সেই রাজধানী যেখানে চার্লস ওয়ার্নার এসেছিল। মার্টেল আর ক্লেয়ার স্টোলারকে বলল শহরের মাঝখানের হোটেলটায় ওদের নামিয়ে দিতে। যে মুহূর্তে ও নামিয়ে চলে গেল সেই মুহূর্তেই মার্টেল কুলিকে বলল ওরা এই হোটেলে থাকবে না।

খানিকটা এগিয়ে একটা ক্যাবেউঠে হাউপ্টব্যানহফের কাছাকাছি একটা জায়গার ঠিকানা দিল। দুজনে খানিকটা পৃথক বসেছে। স্টেশনে নেমে ক্লেয়ার মার্টেলের পেছন পেছন চলল। ক্লেয়ারের হ্যান্ডব্যাগে লুকোনো পিস্তল। দুজনে স্টেশনে জিনিষপত্র জমা রাখলো। এবার মার্টেলের খোঁজ করার পালা কেন ওয়ার্নার এখানে এসেছিল। ক্লেয়ার ওর পেছনেই চলতে লাগল। চারিদিকে ওদের এখন মাকড়সার জাল।

এডুইন ভিনজ। দুবার ভুল করে দিয়েত্রিচের কাছে ধমক খেয়েছিল। গ্রসকে যখন মার্টেল হত্যা করলো তুমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে...।

ধমকানির জবাবে ভিনজের বলার কিছুই ছিলনা। দু-দুবার মার্টেলকে বাগে পেয়েও কিছু করতে পারেনি। দিয়েত্রিচের হুকুম.যেমন করে হোক ওকে মারতে হবে, না হলে খবর যেখানে পৌঁছোবার পৌঁছে যাবে।

হাউপ্টব্যানহফ জায়গাটা চীৎকার, চেঁচামেচিতে একেবারে নরকের মতো। মার্টেল জনতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললো।

চারিদিকে শুধু ভীড়, যাত্রীদের ব্যস্ততা, ঘোষকের চীৎকার সব মিলিয়ে একটা গতিময় জীবন।

ক্লেয়ার মার্টেলের পেছনে। ব্যাগের নীচে লুকোনো পিস্তল। হঠাৎ ওর যাকে নজরে পড়ল সে হল স্বয়ং এডুইন ভিনজ।

ক্লেয়ার নিশ্চিত ভিনজ ওকে চিনতে পারেনি। ব্যাগ থেকে কালো চশমাটা বের করে পড়ে নিলো।

মার্টেল অন্যদিকে অন্যকিছু দেখছিল। কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে ও অনুভব করছিল যেন চারিদিক থেকে অনেকে ওকে ঘিরে ধরেছে। দূরে একজনের পকেটে দেখল ডেলটা ব্যাজ। জুরিখ থেকে মিউনিখ এক্সপ্রেসটা এসে যেখানে থামবে লোকটা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

মার্টেল সামনের টাইম বোর্ড দেখার ভান করে,লোকটাকে দেখতে লাগল। আর একজন পকেটে ডেলটা চিহ্নিত লোক ওর কাছে এসে দাঁড়ালো। ক্লেয়ার ইতিমধ্যে মার্টেলের

কাছে এসে সন্তর্পণে সতর্ক করে দিলো যে, এডুইন ভিনজ এখানেই আছে। মার্টেলের ওপর নজর রেখেছে। বাকি দুজন কাফেতে ঢুকলো।

মার্টেলও ক্লেয়ারকে সাবধান করে দিল যে জায়গাটা ডেলটার লোকেরা ঘিরে রেখেছে। এরপর ক্লেয়ারের কাছ থেকে মার্টেল চলে যেতে ও ট্রেনটাইম লিখে নিল। মার্টেল গিয়ে ঢুকল ঐ ক্যাফেটেরিয়ায়।

একটা বসার টেবিলে বসে ও কফির অর্ডার দিলো। টেবিলটার সামনে একটা বন্ধ দরজা। কিছুটা দূরে ডেলটার লোকদুটো কথাবার্তায় ব্যস্ত। আগের লোকটা পরের লোকটাকে একটা খাম দিতে ও পকেটে পুরে নিলো।

মার্টেল যেন একটা ফাঁদের মধ্যে ঢুকল।

ঠিক বেরোবার মুখে ওরা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা বন্ধ করে। পাঁচজনের চেহারাই ষণ্ডা মার্কা। তাদের একজন মার্টেলের টেবিলে এসে বসে একটা নোটবুক আর পেনসিল টেবিলের ওপর রাখলো। পেনসিলটার একটা বোতাম টিপতেই একটা উঁচ বেরিয়ে এলো। মার্টেল এতক্ষণ একটা পাত্রে মাথা নীচু করে কি যেন দেখছিল। সঁচটা বার হতে মার্টেল পাত্রের তরলটা ওর চোখের ওপরে ছুঁড়ে দিল আর লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল থেকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ বাতাসে ভেসে গেল।

মার্টেল লাফিয়ে উঠে টেবিলটা সামনের দিকে ঠেলে দিল, তারপরে চেয়ারটা সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলে। দরজার মুখের লোকগুলো অস্বাভাবিক আতঙ্কে পালাতে পারলে বাঁচে।

–এই দিকে পালাও।

মার্টেল দেখল দরজার সামনে ক্লেয়ার দাঁড়িয়ে পর পর তিনবার গুলি করলো। অবশ্য সবগুলোই মাথার ওপর দিয়ে গেছে।

মার্টেল দৌড়ে গিয়ে সামনের লোকটার মাথায় আঘাত করল। ক্লেয়ার পিস্তল লুকিয়ে ফেলেছে। মার্টেল ক্লেয়ারের হাত ধরে এগোতে লাগল। ওদের পেছনে তখন সবাই ভয়ে আতঙ্কিত। সবাই পালাতে চায়। ইউব্যানসিস্টেম একটা স্বয়ংক্রিয়, জটিল ব্যবস্থা। ওরা এই সিস্টেমে দ্রুত বেরিয়ে এসে ট্রেনে এসে বসল।

মার্টেল আর ক্লেয়ার পাশাপাশি বসল। মার্টেল নিশ্চিত যে কেউ ওদের অনুসরণ করছে না। সার্টেল ওকে জানালো ওরা সোজা ফ্লাউসেনে যাবে। এখন রাস্তার ধারে ছোটখাটো হোটেলে ওঠা যাক। ব্যাগ-ট্যাগ পরে আনা যাবে।

***

ওয়াশিংটন থেকে রবিবারের ফ্লাইট হিথরোতে এসে পৌঁছবে রাত নটায়। পার্ক ক্রিসেন্টে ইডের ক্যাব ছিল। ম্যাকনেইল অফিসেই অপেক্ষারত।

-খবরটা সবে টেলেক্সে এসেছে।

ম্যাকনেইল টুইডের রিসিভ করার খবর জানে কিনা জানে না। ও খবরটা জিজ্ঞেস করতেই ব্যাকনেইল জানালো, তোমার বন্ধু ক্লিন্ট লুমিস খুন হয়েছে।

টেলেক্সটা হাতে নিয়ে টুইড পরপর তিনবার সংকেতটা পড়ল। ম্যাকনেইলের হাতে নোটবুক।

টেলেক্সের সংকেতটা হল

প্রাক্তন সি. আই. এ এজেন্ট ক্লিন্ট লুমিস আজ আততায়ীর দ্বারা নিহত হয়েছে ক্রুজার ওয়েসিসেই আর একটা ক্রুজার-গ্রেনেডের আঘাতে নিহত লুমিসের কুকুরও নিহত–এস. বি. মাই. সি. আই. এর সহযোগিতায় তদন্ত চালাচ্ছে।

টুইডের হেলিকপ্টারের কথা মনে পড়ল। চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ম্যাকনেইল জিজ্ঞেস করল, মার্টেলের কোন খবর আছে কিনা?

টুইড জানালো যে, ব্যাভেরিয়া থেকে ও ফোন করেছিল। কাল সকালে এসে পৌঁছবার কথা। জিহররাতে সাজানো হোটেল বুক করা হয়ে গেছে। ম্যাকনেইলকে ওর সমস্ত ব্যবস্থা করতে বললো। টুইড সামনের খোলা জানলায় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। চিন্তাশূন্য মন। সামিট এক্সপ্রেস আর মাত্র দুদিন বাকি।

মাঝরাতে মিউনিখের অ্যাপার্টমেন্টে ম্যানফ্রেড যখন ঘুমোচ্ছিল,তখনই ওয়াশিংটন থেকে খবর এসে পৌঁছালো।

আলো জ্বালিয়ে গ্লাভসহাতে তুলতেই এক মার্কিনীকণ্ঠস্বর সংক্ষেপেখবরটা জানালো। লুমিস সংবাদদাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। ক্রোকোডাইলকে থামানো সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে আরো বড় খুন।

***

পয়লা জুন; সোমবার

টুইড বলে উঠলো, আমরা আজ আর মঙ্গলবারে খানিকটা বিশ্রাম পাবো। আগামীকাল রাতে সামিট এক্সপ্রেস প্যারিস থেকে ভিয়েনার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে।

মার্টেল চিন্তিত মুখে জবাব দিলো, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের আইডেন্টিফাই-এর কাজটা সেরে ফেলতে হবে। সিকিউরিটির প্রধানের ফোনটা গুপ্তচর...।

লন্ডন বিমানবন্দরের হোটেলে ম্যাকনেইল তিনটে শোবার ঘর ভাড়া নিলো। প্রত্যেকটা পৃথক থামে। টুইড সমস্ত ঘরগুলো ভালো করে দেখে নিল। মার্টেল সবে মাত্র মিউনিখ থেকে ফিরেছে। এরা মাঝের ঘরটাতেই আপাততঃ থাকবার ব্যবস্থা করেছে। লুমিসের হত্যা প্রসঙ্গে ওদের মধ্যে আলোচনা হত যখন সিকিউরিদিকে উঠেছিল।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত যখন সিকিউরিটি কনফারেন্সে লুমিস হত্যার ব্যাপারটা শোনাচ্ছিল তখন নাকি চারজন নিরাপত্তা প্রধানের একজন চমকে উঠেছিল।

এদিকে অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস-এর সমস্ত অতীত একটা ফাইলে রাখা। মিয়েরারও তাই। এদিকে জুরিখ স্টোলারও দুবছর অজ্ঞাতবাসে ছিল। এই সব চমকপ্রদ সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছিল।

এছাড়া হাওয়ার্ড আছে। মার্টেলের বক্তব্য আসল নোক দীর্ঘকাল ধরে এইরকম কাজে নিযুক্ত রয়েছে। মার্টেলের মতে হাওয়ার্ডের বিষয়টা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

খানিকবাদে টুইড ব্রিফকেস থেকে একটা ফাইলের ফটোকপি মার্টেলের হাতে দিল। ফ্রেডারিক অ্যান্টনী হাওয়ার্ডের নাম ওপরেই লেখা। টুইড জানালো এটা পাওয়ার জন্যে ম্যাকনেইলকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। ওই সব সংগ্রহ করেছে। ফাইলের বারো পাতায় এসে ও থামলো। লেখা আছে বেশ কয়েক বছর আগে হাওয়ার্ড প্যারিস দূতাবাসে ইনটেলিজেন্স অফিসার হিসেবে নিযুক্ত ছিল। এর মধ্যে দুসপ্তাহ অসুখের জন্যে ছুটি নিয়ে ও ভিয়েনাতে ছিল।

মেডিক্যাল রিপোর্টও আছে। সমস্তটা ভালভাবে শেষ করে মার্টেল ওটা টুইডকে দিলো। এরপরে টুইড ওকে একটা খাম দিলো। ওর মধ্যে চারটে উজ্জ্বল ছবির প্রিন্ট ছিল। ফ্ল্যান্ড্রেস, ও'মিয়েরা, হাওয়ার্ড আর স্টোলার। মার্টেল খামটা পকেটে রেখে দিলো। তারপর জানালো, সময় আর বেশি নেই এখন চারজন নিরাপত্তা প্রধানের ওপরেই চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ব্যাপারটা কড়া ভাবে ধরতে হবে। চারজনকেই এক কথা বলতে হবে। মার্টেল নিজে স্টোলারকে বলবে আর টুইড হাওয়ার্ড, অ্যালেন আর ও'মিয়েরার ভার নেবে। কথাটা হলো একটা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, একজন পাশ্চাত্য নেতাকে এক্সপ্রেসেই খুন করা হবে। খুনী চারজন নিরাপত্তা প্রধানেরই একজন।

পকেট থেকে প্ল্যাস্টিকে মোড়া একটা কার্ড বের করে টুইড ওর হাতে দিলো। মার্টেল দেখল ও যখন ঘরে অস্থির ভাবে পায়চারীকরছিল, তখনকার ছবি। টুইড ওকে জানালো কাল রাতে সামিট এক্সপ্রেস গেয়ার-দ্য-ইস্ট ছাড়ার আগে ওদের দেখা হতে পারে কিনা। কার্ডটা দেখালে কেউই ওকে আটকাতে পারবেনা।

মার্টেল জিজ্ঞেস করলো, ও এই কার্ড কোথায় পেলো? টুইড জানালো, কার্ডটা পাওয়া গেছে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। ওকে বলেছে যে চারজন নিরাপত্তা প্রধানের মধ্যে একজন খুনী। ব্যাপারটা শুনে প্রধানমন্ত্রী মশাই বেশ চিন্তিত। কথা হতে হতে ক্লেয়ারের একটা পাশপোর্ট ছবিও মার্টেলের হাতে দিলো। ক্লেয়ার না থাকলে মার্টেল হয়তো শেষ হয়ে যেতো। চোখ বুজেই ওকে বিশ্বাস করা যায়। মার্টেলের কার্ডের মতো ক্লেয়ারেরও একটা কার্ড তৈরী হলো। বলা বাহুল্য, যে পেনে সইটা হলো সেটাও প্রধানমন্ত্রীরই পেন। টুইড হাসলো, তারপর আবার জানালো যে, একটা ব্যাপার আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা হলো আমরা যাবার আগেই ম্যানফ্রেড...।

–তাহলে কিভাবে এগোনো উচিত? টুইড বলল, ও সামাদের কাছে আসল খুনীকে চাপা দেবার চেষ্টা করতে পারে। ও জানে যে ব্যাপারটা আমরা জানি। ও চেষ্টা করবে ভুল লোককে যাতে আমরা সন্দেহ করি। সুতরাং–হ্যাঁ। আমরা চারজন নিরাপত্তা প্রধানের প্রত্যেককেই বলব যে তোমাদের মধ্যেই একজন দোষী ব্যক্তি রয়েছে।

***

ম্যানফ্রেড-এর জানানো মিটিং-এর জায়গায় যাবার জন্যে রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ ও অ্যাপার্টমেন্টের তলা থেকে মার্সিডিস গাড়িটা বের করল। এখনও অনেকটা সময় আছে।

মিটিং-এর জায়গাটা বেশ অদ্ভুত। সব দিকে ফাঁকা একটা গুপ্ত গ্যারেজ। ম্যানফ্রেড যে গাড়িটার মধ্যে বসেছিল সেটা মিথ্যে নাম আর ঠিকানায় কেনা। কাগজপত্র সবই জাল। দিয়েত্রিচ এল। ওর গাড়ির জোরালো আলোয় ম্যানফ্রেডের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আলোটা নিভতে ও দেখল কালো পোষাকে, গগলস পরা একজন আলোটা নিভিয়ে জানলা দিয়ে এদিকেই চেয়ে আছে। ম্যানফ্রেডের কাছে এগিয়ে এল। সহাস্যে অভিনন্দন জানিয়ে ও বলল, তুমি যদি নির্বাচনে হেরে যাও, তাহলে তোমার পরিকল্পনা মতে এগোও। তোমার লোকেরা সবাই ইউনিফরম পড়ে প্রস্তুত। মিউনিখে মার্চ করো, হিটফলারের উনিশশো তেইশের মার্চ যেরকম রিপাবলিক তৈরীহয়েছিল, ঠিক সেরকম তুমিও মিউনিখে কর।

–কিন্তু হিটলার তো সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ল্যান্ডবার্গ-এর জেলে ওকে...। দিয়েত্রিচ বলে উঠল।

নতুন অস্ত্রের জায়গাটা কোথায়?ম্যানফ্রেড বলে উঠলো, আমরা একেবারে শেষ সময়ে...। তুমি এখন জায়গাটাকে সুরক্ষিত রাখতে সশস্ত্র প্রহরী লাগাও...।

বলে ম্যানফ্রেড দ্রুত গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে অর্থাৎ দুমিনিট পর দিয়েত্রিচও যাবার জন্যে তৈরী হলো।

***

মিউনিখ বিমান বন্দরে ফিরে এসে মার্টেল শহরের একপ্রান্তে একটা ক্যাব নিলো। খানিকটা গিয়ে ক্যারটা ছেড়ে দিয়ে চারশো গজের মতো হেঁটে ক্লসেন হোটেলে পৌঁছালো। ক্লেয়ার-এর কোন বিপদ হয়নি। মার্টেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

ক্লেয়ার বলল, তুমি ছিলেনা যখন আমি হাউস্টব্যানহফেই বেশি সময় কাটিয়েছি। মার্টেল অবশ্য কাজটাকে সমর্থন করলো না। কারণ চিহ্নিত হয়ে যাবার বিপদ ছিল। অবশ্য ক্লেয়ার জানালো যে, ও বেশ সতর্কই ছিল। মার্টেল দুঃখ প্রকাশ করে বললো, আগামীকাল রাতে সামিট এক্সপ্রেস প্যারিস ছাড়বে। এখনও পর্যন্ত আসল লোককে ধরা যায়নি।

ওদের মধ্যে পরবর্তী কার্যক্রমের নানা বিষয়ে আলোচনা হতে লাগলো। সমস্ত বিষয়টার ওপরে একটা ধোঁয়াশার জাল তৈরী হয়েছে। মার্টেলের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ক্লেয়ারের চোখ এড়ালো না।

ক্লেয়ার বলল, জুরিখ হচ্ছেডেলটার চলমান হেডকোয়ার্টার। সেজন্যই স্টোলার ওদের আসল ঘাঁটি খুঁজে পায়নি। দিয়েত্রিচের জায়গাটা একেবারে দূর্গম। হেড-কোয়ার্টারের উপযুক্ত জায়গাও বটে। সবরকম সুযোগ-সুবিধে আছে। সবসময়ে ভিড়, সুতরাং দুজন বা আরও বেশি লোকের মিটিং-এ কোনও অসুবির্ধেই নেই। দূতেরা ট্রেনে করে এসে খবর দেয় আবার অন্য ট্রেনে চলে যায়। ওরা কেউই আসলে মিউনিখে যায়না। দুএকটা মিটিং যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে। অনেক নিরাপদ জায়গা এখানে। কাফে, সিনেমা এরকম অনেক। মার্টেল এবার ওয়ার্নার-এর গতিবিধির ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। ও ক্লেয়ারকে বলল, তুমি কি বলতে চাইছে, দিয়েছি এখানে, একটা বিশেষ ফোর্স পাঠাচ্ছে।

সম্ভবতঃ এখানে হোটেলে জায়গা নেবে। এছাড়া ওদের লক্ষ্য থাকবে টিভি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে সমস্ত নিয়ন্ত্রণের জায়গাগুলো।

–হ্যাঁ। এটাই আমার অনুমান।

মার্টেল অধৈর্য ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। এক সময় বলে উঠলো, আমাদের এখন স্টোলারের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য খুনী।

ক্লেয়ার ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ঘরের মধ্যে সাময়িক নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো।

***

টুইড শান্তভাবে বললো, অ্যালেন, ভিয়েনার উদ্দেশ্যে যে সামিট এক্সপ্রেস আগামীকাল রাতে ছেড়েছে, তাতে আমরা জানি, চারজন যাত্রীর মধ্যে একজন খুনের লক্ষ্য।

ফ্ল্যান্ড্রেস বলে উঠল, আমাদেরও তাই অনুমান। সেন্ট হর্ন, একটা ছোটখাট রেস্তোরাঁয় ওরা খেতে খেতে আলোচনা করছিল। জায়গাটা নিরিবিলি।

টুইড বললো, ফ্ল্যান্ড্রেস আমাদের বন্ধুত্ব অনেক দিনের, এই বন্ধুত্বের বিশ্বাসে আমি তোমাকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই।

ফ্ল্যান্ড্রেস খেতে খেতে পুরোনো দিনের গল্প আরম্ভ করলো। সেই উনিশশো তিপান্ন সালে ও সেনাবাহিনী ছেড়ে অন্য কাজে যোগ দেয়। এই ধরনের অনেক কথা। কথায় কথায় জানিয়ে দিল হাওয়ার্ডকে ওর পছন্দ নয়,কারণ ওনাকি অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীলনয়।

ফ্লানড্রেস ওর জীবনের অদ্ভুত সব দুর্ঘটনার কথা জানালো। ও প্রথমে মিলিটারী ইনটেলিজেন্সীতে চাকরী পায়। তার দু সপ্তাহ পরে ও কমিশনড র‍্যাংকে চলে যায়, ওর ওপরওয়ালার দুর্ঘটনার ফলে। তারপর ও জেনারেল ডুমার স্টাফে ইনটেলিজেন্স অফিসার হয় এবং ব্যাভেরিয়াতে আসে। তারপর ওখান থেকে প্যারিসে ফিরে আসে। একমাত্র সম্বল ছিল জেনারেল ডুমার রেকমেন্ডেশন। ডিন. এন. টি-কে দেখাতে ওরা আবার ওকে নিয়ে নেয়।

এরকম কথা বলার পরে ফ্ল্যান্ড্রেস একসময় থামলো।

টুইড রেস্তোরাঁর চারদিকটা একবার তাকিয়ে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললো, একজন মৃত লোকের কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেছে। লোকটা কে জানতে চেওনা। তবে আমার বিশ্বাস ও সত্যি কথাই বলেছে এবং সত্যি যে বলেছে সেটা আমি প্রমাণ করতেও পারবো না। ওর বক্তব্য, পাশ্চাত্যের যে চারজন নেতাকে চারজন নিরাপত্তা প্রধান নিয়ে আসছে সামিট এক্সপ্রেসে, তাদেরই মধ্যে একজন পাশ্চাত্যের একজন নেতাকে খুন করবে…।

ফ্ল্যান্ড্রেস শোনামাত্র বলে উঠল, সত্যিই এ তো ভীষণ ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কোন সূত্র পাওয়া গেছে সে কে…?

না। টুইড জানালো।

–তাহলে তো তোমরা আমাকেও সন্দেহ করতে পারো? তোমার কাকে সন্দেহ হয়? এ ব্যাপারে কোন অনুসন্ধান করেছে কি?

ফ্ল্যান্ড্রেস লোকটা বড় বিচিত্র ধরনের। পাশ্চাত্যের নিরাপত্তা প্রধানদের মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন।

টুইড বললো, গত কয়েকদিন কথাটা আমি কাউকে বলিনি, এমনকি হাওয়ার্ডকেও নয়, তোমাকেই প্রথম। কারণ আমি তো সরকারীভাবে সামিট কনফারেন্সের সঙ্গে যুক্ত নই...।

ফ্ল্যান্ড্রেস শুনে বললো, যে ব্যাপারটা ভেবে আমার ভয়ে ঘুম আসছেনা, সেটা হলো ট্রেন গেয়ার দ্য ইস্ট থেকে রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশ-এ ছাড়বে। জার্মানীর সীমান্ত যখন অতিক্রম করবে, তখন সমস্ত জায়গা অন্ধকার।

ফ্ল্যান্ড্রেস ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, ট্রেনটা সাধারণ ট্রেন হলেও ভি. আই. পি যাত্রীদের জন্যে কিছু কোচ সংরক্ষিত, নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খুব কড়া, এছাড়া ওদের নিজস্ব রেস্তোরাঁ।

টুইড বললো, ট্রেনটা মিউনিখে যাবার আগে ছজায়গায় থামবে। ওখানে মানে মিউনিখে চ্যান্সেলার ল্যাংগার থাকবেন। ফ্ল্যান্ড্রেস একটা হতাশার ভঙ্গিমা করল। ওর চোখে কিসের যেন প্রশ্ন উঁকি মারছে। টুইড ওকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করছিল। তাহলে সন্দেহের তালিকায় কে? কে?...।

***

স্টোলারের হেডকোয়ার্টার। সোমবার, সন্ধ্যেবেলা। অপারেটরের কাছে একটা সাংকেতিক নামে ফোন এসেছে। বি. এন. ডি-র প্রধান দুচোখে আশার-আলো নিয়ে নিজের অফিসে বসেছিল। এরিখ স্টোলার রিসিভার হাতে নিতেই অপর প্রান্ত থেকে কথা ভেসে এলো, অস্ত্রের বৃহত্তম গুদামে ডেলটার লোকেরা পাহারা দিচ্ছে..।

একটু থেমে বললো, যতক্ষণ না গুদাম সম্পূর্ণ তৈরী হয়... তোমারা আগামীকাল করো রেইড, অর্থাৎ নির্বাচনের আগের দিন। গুদামটা...।

রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ ওকে গোপন গ্যারেজে যে খবরটা দিয়েছিল, ম্যানফ্রেড সেটা স্টোলারকে জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল।

***

দোসরা জুন, মঙ্গলবার :

যুক্তরাষ্ট্র ব্যাভেরিয়া! টফলার... আগের রাত থেকেই ব্যানার আর পোস্টারে সর্বত্র ছেয়ে গেছে। ছোট ছোট বিমানগুলো থেকে আকাশপথে ঐ একই লেখার লিফলেট ফেলা হচ্ছিল। ব্যাভেরিয়ার নির্বাচনের দুদিন আগে, ডেলটার প্রতীক পকেটে লাগানো, টুপী আর বাদামী শার্ট পরা ডেলটার লোকেরা সারা শহরের সব জায়গায় মার্চ করে বেড়াচ্ছিল। সব জায়গায় চরম বিশৃঙ্খলা।

এদিকে টফলারের লোকেরাও সাদা পোষাকে সজ্জিত হয়ে ব্যানার সহযোগে পথ পরিক্রমা করে বেড়াচ্ছে। ওরা ডেলটার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি। সামনের সারিতে

মেয়েরা ফুল হাতে সারবেঁধে চলেছে আর এই মেয়েদের জন্যে পুলিশও কোনও অ্যাকশন নিতে পারছে না। মিউনিখ শহর মোটর সাইকেলে ছেয়ে গেছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে অফিসের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে এরিখ স্টোলার। ওর অভিব্যক্তি ভয়ানক আকার নিয়েছে।

ও বললো, ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। আর একটা কাজ। আগামীকাল ডেলটার অস্ত্রগুদাম সীজ করা।

ঠিক সেই সময় ক্লেয়ার ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বললো, তোমারই ইনফরমার আবার...।

–ফ্রাঞ্জ আবার ফোন করেছিল।

–তাই নাকি?

স্টোলার এক ধরনের ভঙ্গীমা করে বললো, ফ্রাঞ্জ আমার ইনফরমারের কোড নাম। আমি ওকে ঠিকমত জানিনা, কিন্তু ওর কাছ থেকে সমস্ত খবর পাওয়া যায়।

মার্টেল বললো, একদিকে সামিট এক্সপ্রেস, অন্যদিকে অস্ত্রের গুদাম। সময়টা দারুণ বেছেছে। ওয়ার্নার হেগেন মরার আগে একটা বিপজ্জনক কথা বলে তবেই মরেছে।

স্টোলার কৌতূহল প্রকাশ করায় ও বললো, আমি আর ক্লেয়ার দুজনেই বিশ্বাস করি কথাটা, তা হলো ট্রেনে চারজন নেতার একজনকে যে খুন করবে সে চারজন নিরাপত্তা প্রধানদের মধ্যেই একজন...।

বড় ঘরটার মধ্যে একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ছিল, উত্তেজনা বাড়ছিল। ক্লেয়ার চুপচাপ দাঁড়িয়ে। স্টোলার কফিতে চুমুক দিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্টোলার আর মার্টেল পরস্পরের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন উভয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে। স্টোলারের মুখ ক্রমশ বিবর্ণ হতে শুরু করেছে।

মার্টেল সেটা লক্ষ্য করে বললো, আমার কাজ হচ্ছে চারজনের মধ্যে একজনকে ঠিকমত চিহ্নিত; করা। চারজন হচ্ছে ও'মিয়েরা, ফ্ল্যান্ড্রেস, হাওয়ার্ড ও তুমি। আজ রাতে ট্রেন প্যারিস ছাড়ছে।

একটু থেমে মার্টেল আবার বললো, হেগেনের কথা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য।

স্টোলারের তখন এমন অবস্থা যে সামনে যে কাউকেই অসহ্য মনে হচ্ছিল তার। সে একটু একা থাকতে চাইছিল। মার্টেল সেটা বুঝল।

***

ক্লেয়ার বলল, তুমি স্টোলারকে ঐরকম কথা কেন বললে? ও তো আমাদের সাহায্য করছে।

ক্লসন হোটেলের ঘরে মার্টেল বিছানায় আর ক্লেয়ার অস্থিরভাবে পায়চারী করছে। এক সময় ও মার্টেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, টুইড আর আমি ওর সঙ্গে লন্ডন বিমানবন্দরে যোগাযোগ করেছিলাম। এখন তো ভালো...। আর এখন...।

–এখন ওরা পরস্পরকে নজরে রাখবে।

ক্লেয়ারে বলল, তুমি নিজেকে স্টোলারের শত্রু বানিয়ে ফেললে।

মার্টেল বলল, ও দোষী হলে তবেই...।

***

প্যারিস থেকে টুইড আসছে। ওরা দুজন অফিসে বসে ওর অপেক্ষাতেই। ম্যাকনেইল দুচোখ বঁজে ভাবছে, একটা বড় সমস্যা সামনে ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

টিম ও'মিয়েরা –হাওয়ার্ড পরিচয় করিয়ে দিল। টুইডের সঙ্গে করমর্দন না করে ও শুধু তাকিয়ে রইল।

যখন ক্লিন্ট লুমিসের ক্রুজারে ছিলে তখনই কেউ ছবিটা তুলেছে।

টুইড ওর হাত থেকে ফটোগ্রাফটা নিয়ে দেখলো। সূর্যের দিকে টুইড তাকিয়ে আছে, ছবিটা এইরকম। ল্যাংগলের সি. আই. এ ল্যাবরেটরীতে অত্যন্ত চতুরভাবে ছবিটা করা হয়েছে।

—ভালো হয়েছে? হাওয়ার্ড বলে উঠল।

-এটা তুমি কি করে পেলে? ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

টুইড ও'মিয়েরার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো। টুইডের প্রশ্নটা শুনে হাওয়ার্ডের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে গেল।

হে ঈশ্বর, তুমি কি...।

না। টুইড বেশ কঠিন স্বরেই জবাব দিলো।

আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে তুমিই আক্ষেপ...।

ফটো তোলার ব্যাপারটা আমি জানি, বলে ও'মিয়েরার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে, কিন্তু আমি জানতে চাই তুমি এ ছবি কোথা থেকে পেলে?

ল্যাংগলেতে একজন দূতের কাছ থেকে পাওয়া...।

ও'মিয়েরা টুইডের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো।

টেলিফটো লেন্সে ছবিটা তুলে তারপর ওটাকে বাড়ানো হয়েছে। টুইড ধীরে ধীরে বলে উঠলো, সমস্ত কিছুই ম্যানফ্রেডের চালাকি। লুমিস আর আমাকে ও ডালাস থেকে অনুসরণ করেছিল। সমস্ত ব্যাপারটা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা।

খানিক পরে টুইড, হাওয়ার্ড আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ড্রয়ার খুলে তিনটে জিনিস বের করে টেবিলের ওপর রাখলো। একটা ৩৮ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন স্পেশাল, কালো রঙের একটা ব্যারেট, আর একজোড়া বড় আকারের সানগ্লাস এর সঙ্গে একটা কালচে নীল উইন্ড চিটার।

–প্রশ্নটা খুবই ইন্টারেস্টিং, টুইড বলে উঠলো, গত শুক্রবার সকালে লন্ডনে কে ছিল, যখন ম্যানফ্রেড কার্লোস পিকাডিলিতে ছিল?

আমরা সিকিউরিটি মিটিং-এ প্যারিসে ছিলাম। তারপর আমি মধ্যাহ্নের প্লেন ধরি।ও'মিয়েরা বলে উঠলো।

–আমি সকাল দশটার ফ্লাইটে...।

অন্য আমেরিকানদের মতো ও দ্রুত বলে থেমে গেল। টুইড প্রথমে ওদের দুজনের দিকে তাকালো, তারপর বললো, এতেই তোমাদের নির্দোষ বলা যায় না। সকালনটা নাগাদ পিকাডিলিতে একজন পুলিশ এক বন্দুকধারীকে দেখে। তারপরে সেখানে টেগারে জিনিস পাওয়া যায়। অস্টিন রীডা। এখন আমার প্রশ্ন এই রহস্যময় ব্যক্তিটি কে? যে এত তাড়াতাড়ি লন্ডনে সাক্ষাৎ করতে এসে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল?

হঠাৎ দরজাটা খুলতেই টুইড থেমে গেল। ঘরে ঢুকলো হাওয়ার্ডের ডেপুটি ম্যাসন।

টুইড বললো, ঘরে ঢোকার আগে তোমার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। আমরা এখন একটু ব্যস্ত আছি।

-কিন্তু আমি তো আমন্ত্রিত...।

–তবু বলছি তুমি এখন যাও। টুইড ওর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো স্পষ্টভাবে বললো। ম্যাসন হাওয়ার্ডের দিকে তাকালো, হাওয়ার্ড জানলার দিকে তাকিয়ে, ঘর নিস্তব্ধ। ম্যাসন দেখল, টুইড একই ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে। ম্যাসন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ নীরবতা। টুইড এবারে নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, যাক, পিকাডীলির ঘটনায় আসা যাক। আমার অনুরোধে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ ঐ আইটেমগুলো বিশ্লেষণ করার জন্যে ফরেনসিকে দিয়েছিল। ম্যানুফ্যাকচারের কোন লেবেল নেই। বিশ্লেষণের রিপোর্ট, ব্যারেটটা গায়নার। উইন্ডচিটার আর গগলসটা হচ্ছে ভেনেজুয়েলার। বন্দুকের ব্যাপারটা জানা যায়নি। এতে কি কিছু বোঝা যাচ্ছে?

দক্ষিণ আমেরিকা। ও’মিয়েরা বলে উঠলো, আবার কার্লোস?

টুইড বলল, আমরা অনেক স্পষ্ট সংকেত পাচ্ছি, কিন্তু আমি এখন সংকেত খুঁজছি যেটা স্পষ্ট নয়।

হাওয়ার্ড ভুরু কুঁচকে বললো, কি বলতে চাইছ তুমি। তাছাড়া সামিট এক্সপ্রেসের সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক?

–আসলে প্রশ্নটা সময় নির্বাচনের। টুইড ও’মিয়েরার দিকে তাকালো। বলল তোমার একটু ইতিহাস জানা দরকার। সেই উনিশশো উনিশে যখন জার্মানীর পতন হচ্ছে তখন

সোভিয়েট রিপাবলিক ব্যাভেরিয়াতে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। এটাই হচ্ছে অপারেশন ক্রোকোডাইলের আগের ঘটনা। সৌভাগ্যবশতঃ তথাকথিত জনতার গভর্নমেন্ট অবশিষ্ট জার্মান সৈন্য আর ফ্রেইপদের দ্বারাই ধ্বংস হয়েছিল। এবারে ম্যাপটা দেখ...।

টুইড একটা ম্যাপ খুললো। লেক কোল্সট্যাঞ্জ-এর আকারটা একেবারে কুমীরের মতো। এটাই ওদের চক্রান্তের কেন্দ্রস্থল, ব্যাভেরিয়াই ওদের লক্ষ্য। ওদের তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ গভর্নমেন্ট করা। টফলারের সঙ্গে কমিউনিস্টদের যোগাযোগ আছে। কোসট্যানঞ্জ উপকূলেও ব্যাভেরিয়ার একটা ছোট্ট অংশ আছে। আমার কাছে যা রিপোর্ট আছে তাতে ওখানে চেকোশ্লোভাকিয়ার একটা গোপন মোটর টরপেডো বোটের ফ্যাক্টরী...।

–কিন্তু চেকদের কোন সীমারেখা নেই।

বুঝলাম। টফলার যখন ক্ষমতা পাবে তখন টর্পেডো বোট স্থলপথে এসে লেকে কোল্সট্যানঞ্জে পৌঁছবে। কয়েকটা মাত্র রাইন ডেলটাকে জব্দ করার জন্যে যথেষ্ট। এমনকি পরে অস্ট্রিয়া থেকে ভোরালবার্গ রাজ্যকেও হাতে পাবে।

ব্যাপারটা তো খুবই উদ্বেগের...। ও'মিয়েরার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

টুইড বলল, ফেডারেল রিপাবলিকের থেকে ব্যাভেরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস এতে পশ্চিম জার্মানীর এক তৃতীয়াংশ সোভিয়েটের প্রভাবাধীনে চলে যাবে। সমস্ত পরিকল্পনা ম্যানফ্রেডের। সুতরাং ক্রোকোডাইল...।

ও'মিয়েরা বলে উঠলো, তুমি কি নাটক করছে।

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার্ড বলল, না ও ঠিকই বলেছে।

টুইডের ভুরু কুঁচকে গেল হাওয়ার্ডের কথায়।

হাওয়ার্ড আবার বলে উঠলো, রাজনৈতিক কারণে ফেডেরাল রিপাবলিক থেকে যদি ব্যাভেরিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সোভিয়েটের দখলে পশ্চিম ইউরোপে ক্রেমলিনে ঢোকার চাবিকাঠি হয়ে উঠবে।

কিছুটা চুপ করে হাওয়ার্ড টুইডের কাছে জানতে চাইল, এবারে বলল তোমার খবরের উৎসটা কি?

টুইড বলল, ওয়ার্নার হেগেন। রেইনহার্ড দিয়েত্রিচের ভাইপো। ওরই কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে যে সিকিউরিটি চীফের চারজনের একজন খুনী...।

হাওয়ার্ডের মুখে একটা অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা গেল। ডেস্কের চারদিকে পায়চারী করতে করতে বলল, এর জন্যে তোমার চাকরী যেতে পারে জানো?

-যদি আমি ভুল করি তাহলে তুমি তা করতে পারো। আর আমার কাজ যদি ঠিক হয়, তাহলে আমি তোমার কাছে জবাবদিহি...।

ও'মিয়েরা ক্রোধে ফেটে পড়ল। বলল, প্রথমে ক্লিন্ট লুমিসকে হত্যা করার ব্যাপারে জড়িয়ে ছিল, তারপর এখন সব পাগলামী কথাবার্তা।

টুইড ওদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলে উঠলো, ফ্ল্যান্ড্রেস কিন্তু ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই নিয়েছে। আমি ওর সঙ্গে প্যারিসে মাত্র একবারই দেখা করেছিলাম।

হাওয়ার্ড উত্তেজনায় কম্পিত হাতজোড়া পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে। টুইড তীক্ষ্ণভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, সামিট এক্সপ্রেসের নিরাপত্তার ব্যাপারে তোমার কোন অধিকার নেই। তোমার বিবৃতি ঠিক নয়। কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে...।

ও'মিয়েরা উন্মাদের মতো চীৎকার করে উঠলো, ওয়াশিংটনের কানে এসব যাবে। একজন সিনিয়ার ব্রিটিশ এজেন্ট তার নিরাপত্তা প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে চমৎকার।

আমি বলেছি চারজনের মধ্যে একজন। টুইড কঠিন চোখে বলে উঠলো, আগে থেকেই সব ঘটছে। এটা মনে রেখো চ্যান্সেলার উইলি ব্রানটটের ঘনিষ্ঠ লোক গন্টার জিলামো সোভিয়েট প্ল্যান্ট বাতিল করে দিয়েছিল।

–তাতে ব্রানট-এর ক্ষতিই হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে ও হাওয়ার্ডের দিকে তাকালো, অনেক বছর আগে থেকেই খুনী নিযুক্ত হয়েছে। ট্রেন আজ রাতে। অতএব প্রচণ্ডভাবে সতর্ক থাকলেই সবার মঙ্গল...।

***

দোসরা জুন, মঙ্গলবার :

নাম : অ্যালেন ডোমিনেকো ফ্ল্যান্ড্রেস।

জাতি : ফরাসী

জন্ম তারিখ : ঊনিশশ আঠেরোই জানুয়ারি।

জন্মস্থান : স্ট্রাসবার্গ।

টুইড তার অফিসে বসে, ম্যাকনেইলের দেওয়া ফাইলটায় চোখ বোলাতে বোলাতে চেয়ারে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছিল।

ফ্ল্যানড্রেসের অতীত ইতিহাস সম্বলিত আছে এই ফাইলে।

ক্যারিয়ার রেকর্ড? ইংল্যান্ড থেকে পালিয়েছিল ঊনিশশ চুয়াল্লিশ এর এপ্রিলে। যুক্ত ফরাসী বাহিনীর লেফটান্যান্ট হয়েছিল। জার্মান ভাষায় দক্ষতার জন্যে পরে মিলিটারী ইনটেলিজেন্সে নিযুক্ত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পরে জেনারেল ডুমার স্টাফ হিসেবে ওকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ফ্রান্স অধিকৃত ভোরালবার্গ আর টেরেলে।

এরপরে উনিশশ তিপান্ন তে আবার ফ্রান্সে ফিরে আসে। সবশেষে ঊনিশশ আশি সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতির স্পেশ্যাল গার্ড ইউনিট-এর সিক্রেট সার্ভিস-এর ইনচার্জ-এর দায়িত্ব গ্রহণ করে।

টুইড পুরো ফাইলটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ম্যাকনেইলকে জিজ্ঞেস করলো, ওর বিবাহিত জীবন?

স্মৃতি হাতড়ে ম্যাকনেইল বলল, লিলির টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারের এক মেয়ে লুসিল ডুর্যান্ডকে ও বিয়ে করে।

টুইড বলে উঠলো, ক্লু যে কোথায় পাওয়া যায়...।

–ওর সাতজন মিসট্রেস, যতদূর জানি। ম্যাকনেইল বলল।

এরপর আলোচ্য ব্যক্তির নাম হচ্ছে ও'মিয়েরা। ফাইল দেখে টুইড বলল, এটা তো আরো বড় মনে হচ্ছে। টেনে নিল ওটাকে। পড়তে লাগল,

নাম : টিমসি প্যাট্রিক ও'মিয়েরা।

জাতি : মার্কিনী।

জন্মতারিখ : উনিশশ ত্রিশ সালের সেরা রা আগস্ট।

জন্মস্থান : নিউইয়র্ক সিটি।

ক্যারিয়ার রেকর্ড : উনিশশ ষাট থেকে ঊনিশশ পয়ষট্টি পর্যন্ত ল্যাংগলেতে সি. আই. এ র ক্রিপটো অ্যানালিসিস সেকশানের সঙ্গে যুক্ত। উনিশশ পঁয়ষট্টি থেকে উনিশশ বাহাত্তর অবধি ওখানেই যুক্ত ছিল। পরে উনিশশ বাহাত্তর থেকে উনিশশ চুয়াত্তর অবধি পশ্চিম

বার্লিন স্টেশনে কন্ট্রোলার ক্লিন্ট লুমিসের সঙ্গে কাজ করেছিল। দুজনের ইউনিট। অন্য জুনিয়ার মেম্বার লুজা কারসন। বার্লিনে আঠারো বছরের এক জার্মান মহিলার প্রেমে পড়ে, নাম ক্লারা বেক। এরপরে ইউনাইটেড স্টেটসে ফিরে ল্যাংগলেতে–অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদে উন্নীত হয়। সবশেষে সিক্রেট সার্ভিসে...।

টুইড হঠাৎ থামল বিয়ে করেনি?

–হ্যাঁ। ম্যাকনেইল একটা হলদে রঙের ফাইল এগিয়ে বলল, বিয়ে হয়েছিল ন্যানসি মার্গারেট চেজ, শিক্ষিকার সঙ্গে। ওর বাবা ফিলাডেলফিয়ার একজন ব্যাংকার। নোকটা একটাই বিয়ে করেছিল। এখন ওর সেনেটে দাঁড়াবার ইচ্ছে।

ম্যাকনেইল জানতে চাইল, ও ও'মিয়েরা আর হাওয়ার্ডের ওপরে এত উত্তেজিত হলো কেন?

টুইড সহাস্যে বলে উঠলো, এটা আমার খেলার সবে শুরু। আর আমার সহযোগী মার্টেল তো আছেই।

***

মার্টেল স্টোলারকে বলল, আমি রেইনহার্ড দিয়েত্রিচকে ফোন করতে যাচ্ছি। মিউনিখের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ওদের কথা হচ্ছিল। স্টোলার খানিকটা অবাক হয়ে বলল, তুমি পাগল হয়ে গেছ।

মার্টেল ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। আমার ধারণা ভি ডেলটার সঙ্গেই গুপ্তচক্র গড়ে তুলছে যা দিয়েত্রিচের অজানা। এই চক্রটা সরাসরি পূর্ব জার্মানদের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে। এর অর্থ সোভিয়েট নিয়ন্ত্রিত। আমার কাজ দিয়েত্রিচের মনে সন্দেহ জাগানো। তাহলে শেষমুহূর্তে অন্তত অপারেশন ক্রোকোডাইল ভেস্তে যাবে। সামিট এক্সপ্রেস আজ রাতে ছাড়ছে। সুতরাং এই সুযোগ...।

স্টোলার নির্বাক হয়ে মার্কেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মার্টেলকে চারবার আঘাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিবারেই ডেলটার প্রতীক এমনকি ওয়ার্নারের মৃতদেহেও তা পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা খুবই কাঁচা...।

মার্টেল জানালো যে ও বিদেশী সংবাদদাতা হিসেবে ব্যাপারটা দিয়েত্রিচকে জানাবে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠতে অপর প্রান্ত থেকে টুইডের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ওদের সতর্ক কথাবার্তা স্টোলার টেপ করে যাচ্ছিল।

কথাবার্তার সারাংশ হলো, কেইথের জন্যে একজন দূত কিছু গোপন রেকর্ড নিয়ে যাচ্ছে, যা ওর কাজে লাগবে। ওরই সহযোগী দূত মিউনিখ বিমানবন্দরে পৌঁছবে।

স্টোলার মার্টেলের পদক্ষেপ একবারেই বুঝছিল না। দিয়েত্রিচের ডেরায় ও পৌঁছতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা নির্মম ভাবে ভয়ঙ্কর।

এদিকে স্টোলারকেও আজ রাতে জরুরী বন-এ যাওয়া দরকার...।

***

মার্টেল আর ক্লেয়ার বাড়িতে বসেছিল। ক্লেয়ার বলল, স্টোলারের অফিসে কি হচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তবে মনে হয়, কোড সংকেত বিনিময়।

মার্টেল বললো, যাই হোক স্টোলার-কে একটু বিষয় মনে হল। টুইড আজ সন্ধ্যেতে একটা দূত পাঠাচ্ছে। দেখা যাক কি হয়।

***

গাড়ি দ্রুত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে...।

কখন ব্রিটিশ রিপোর্টার ফিলিপ জনসন আমার সঙ্গে দেখা করবে দিয়েত্রিচ? তুমি কেন রাজি হলে?

ম্যানফ্রেড কথাগুলো বলে রিসিভারটা শক্ত করে ধরে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলো।

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর দিয়েত্রিচ বলে উঠলো খুব ধীরে ধীরে, কারণ আমি নিশ্চিত, সে হচ্ছে কেইথ মার্টেল যে আমার ভাইপোকে খুন করেছে।

একটু থেমে দিয়েত্রিচ আবার বলল, আমি সব খোঁজখবর এর মধ্যে নিয়েছি। আসল ফিলিপ জন্ এখন প্যারিসে।

সাবধানে এগিয়ে।

–বটেই তো। দিয়েত্রিচের কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য।

***

৫. মিউনিখের রাস্তায়

মিউনিখের রাস্তায় ম্যানফ্রেড উন্মত্তের মতো গাড়ি চালাচ্ছিল। কালো চশমায় দু-চোখ ঢাকা, মাথায় টুপী। সীটের পাশে ব্যাগের মধ্যে লুকোনো রিভালভার।

দিয়েত্রিচের এস্টেটের আধমাইল দূরে ও গাড়িটা থামালো। সামনেই একটা জীর্ণ গাড়ি। ওখানেই ভিনজের সঙ্গে গোপন আলোচনা হয়েছিল। গেটের ভেতরে উঁচু পাহাড়ের মত এলাকা, যেখান থেকে স্বচ্ছন্দে গুলি চালানো যায়। গাড়িটা আবার চালিয়ে গেটের সামনে নিয়ে গেল। ম্যানফ্রেডের দৈহিক শক্তি প্রচণ্ড গাড়ি দিয়ে রাস্তাটাকে আড়াল করে দিল। পরক্ষণেই কি ভেবে আবার রাস্তার অর্ধেকটা ফাঁকা করে দিল। নিজের গাড়িটা গাছের আড়ালে রেখে দিল। ফোনে দিয়েত্রিচের সঙ্গে কথামত হাতে বন্দুক নিয়ে উঁচু জায়গায় গিয়ে বসল। ওকে কেউ দেখতে পাবেনা। এরপর অপেক্ষার পালা।

খানিক বাদেই একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। দূরে মার্টেলের নীল গাড়িটা ওর চোখে পড়ল। বন্দুক তাক করে স্থির লক্ষ্যে...।

ব্যাপারটা ঠিক হয়নি মনে হচ্ছে। গাড়ির ভেতর ক্লেয়ার মার্টেলের দিকে তাকালো। মার্টেল– মুগ্ধ চোখে জায়গাটা দেখছিল। ম্যাপ দেখে মার্টেল বুঝলো যে ওরা মূল প্রবেশপথের দু-মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। ব্যাভেরিয়ার উঁচু প্রান্তর জুড়ে সবুজ ঘাস বিছানো রয়েছে। মার্টেল বলল, তোমার ওখানে যাওয়াটা ঠিক হবেনা।তুমি এখানেই গাড়িটা নিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা কর। একঘণ্টার মধ্যে যদি না আসি সোজা গিয়ে মিউনিখে স্টোলারকে খবরটা দেবে।

–কোন ভয় নেই। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

–তাহলে বিপদে পড়লে খবর দেবার যে কেউ থাকবেনা।

হঠাৎ সামনেই সেই জীর্ণ গড়িটা অর্ধেক রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে। আয়না দিয়ে পেছনে তাকালো মার্টেল। চারিদিক খাঁ খাঁ মরুভূমির মত। গেটটা বন্ধ। ভেতরে দেখা যাচ্ছে উঁচু পাহাড়ের মতো অঞ্চল। এতই উঁচু যে ও পাশের জিনিস চোখে পড়েনা। ও খুব আস্তে গাড়িটা এগোতে লাগল।

ক্লেয়ার কালো চশমা খুলে সামনের দিকে তাকালো। হঠাৎ উঁচু জায়গাটায় চোখ আটকে গেল। মনে হচ্ছে কেউ রয়েছে ওখানটায়। সঙ্গে সঙ্গে মার্টেলকে বলল, ঐ জায়গাটায় কেউ রয়েছে।

ম্যানফ্রেডের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে গাড়িটা। মার্টেলের নীল গাড়িটা একেবারে নিশানার মধ্যে। ও ট্রিগারটা টিপল।

–একেবারে নড়োনা।

মার্টেল সজোরে ধাক্কা মারল জীর্ণ গাড়িটায়। ঠিক সেই ফাঁকে একটা শব্দ হলো। বুলেটটা সোঁ করে ঘাড়ের পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেল। ও নীচে নেমে পড়ে থাকা গাড়িটাকে সামলাতে চেষ্টা করল। তারপর একাই এগোল।

ম্যানফ্রেডের প্রথম গুলি ব্যর্থ। ব্যাপারটা অভাবনীয়।শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই পজিশন নিয়ে ফেলেছে। ও দ্রুত জায়গা ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করলো। গন্তব্য মিউনিখ।

***

মঙ্গলবার, দোসরা জুন :

নাম : ফ্রেডরিক অ্যান্টনী হাওয়ার্ড।

জাতি : ব্রিটিশ।

জন্ম তারিখ : বারই অক্টোবর, ঊনিশশ তেত্রিশ।

জন্মস্থান : চেলসা, লন্ডন।

ক্যারিয়ার রেকর্ড : ঊনিশশ আঠান্ন–তে বিদেশ দপ্তরে যোগ দেয়। ইনটেলিজেন্স সেকশনে যোগ দেয় ঊনিশশ বাষট্টির মে-তে। এরপরে ঊনিশশ চুয়াত্তর সালের মে মাসে ইনটেলিজেন্স অফিসার হিসেবে প্যারিস দূতাবাসে যোগদান। ঊনিশশ আটাত্তর জানুয়ারি মাসে ছ-সপ্তাহের স্পেশাল লিভ। শেষে ঊনিশশ আশির মে মাসে এস. আই. এন–এর প্রধান হিসাবে কার্যভার নেয়।

ম্যায়ডা ভ্যালে-তে নিজের ফ্ল্যাটে টুইড সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে দেখছিল। পাশেই ম্যাকনেইল।

টুইড বলে উঠলো, এই বিশেষ ছুটি নিয়ে ও ভিয়েনাতে কাটিয়েছিল।

ভিয়েনার ব্যাপারেই ওর মনে পড়ল কিম ফিলবির কথা। ভিয়েনার এক মহিলার সংশ্রবে ফিলবি সংক্রামক একটা রোগে আক্রান্ত হয়। এখানেই।

সমস্ত ফাইল দেখলেই বোঝা যাবে।

***

রেইনহার্ড দিয়েত্রিচের অট্টালিকায় প্রবেশের মুখে চীৎকারটা ছড়িয়ে পড়ল। একপাল শেফার্ড কুকুর মার্টেলের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। প্রহরী-বেষ্টিত থাকায় তা সম্ভব হচ্ছেনা।

মার্টেলের দিকে তাকিয়ে ধূসর চোখজোড়া প্রশ্ন করল, কি চাই?

–আমি টাইম পত্রিকার ফিলিপ জনসন। মিঃ দিয়েত্রিচের সঙ্গে দেখা করতে চাই। উনি এখানে আসতে বলেছেন।

ভিনজ বললো, পায়ে হেঁটে এলে কেন?

ও জানালো, গাড়ি রাস্তায় খারাপ হতেই এই অবস্থা। এরপর মার্টেল ওর পরিচয়পত্র দেখাল।

দূরের আকাশে তখন হেলিকপ্টারের মৃদু শব্দ। ভিনজ ওর কার্ডটা দেখে ফেরৎ দিলো।

–আমরা এখন মূল জায়গায় যাবো।

এরপর ওরা সামনের দিকে এগোল। প্রথম গেটটা পেরোতেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল।কুকুরগুলো ওখানেই রয়ে গেল। সবার কোটের পকেটে ডেলটা আঁকা।

ভিনজের গাড়ি এগোল। সামনে ও আর মার্টেল। মার্টেল দ্রুত পেছন ফিরে দেখল, দুজন সশস্ত্র প্রহরী ঘড়ি দেখল। উঁচুতে হেলিকপ্টারের বিচরণ।

পাঁচ মিনিট স্বাভাবিক কাটলো। চোখে পড়ল মূল অট্টালিকা।

প্রবেশ পথটা ধনুকাকৃতি। গাড়িটা এগিয়ে অবশেষে মূল বিল্ডিংটার কাছে থামলো। সামনে দাঁড়িয়ে দুজন। একজন পুরুষ অন্যজন রমণী।

রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ চমৎকার পোষাকে, মুখে সিগারেট নিয়ে যেন ওর জন্যেই অপেক্ষায় রয়েছে। কঠিন দৃষ্টি। মহিলাটি অন্যরকম। মৃদু হাসলো। ইনিই স্বয়ং ক্লারা বেক।

সবাই মিলে হলঘরে প্রবেশ করল। ভিনজ আর ওর দুজন সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হয়ে মার্টেল এগোতে থাকল। নিজের অস্ত্রগুলোর কথা মনে করার চেষ্টা করল। সমস্ত ব্যাপারটা দেখেশুনে হিটফলারের কথা মনে পড়লো। দিয়েত্রিচ ও ভিনজকে দাঁড়াতে বললো। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, ঐ দুজনকে বাইরে পাঠিয়ে দাও।

ভিনজের হাতেও পিস্তল। মার্টেল তাকালো চারিদিকে, একটা বিরাট ডেস্ক সামনের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

দিয়েত্রিচের মুখে ব্যঙ্গেরা হাসি। গমগমে কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, তুমি বসতে পারো মার্টেল। ফিলিপ জনসনের রহস্যটা সমাধান করা যাক। বরং আমি পরামর্শ দিই...।

ক্লারা বেক ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। মার্টেল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসতে বসতে দেখল ক্লারা অপূর্ব সুন্দরী। শেষে দিয়েত্রিচ ওর বিশেষ চেয়ারে বসে বলল, তুমি এখানে এলে কেন? এতো আত্মহত্যার সামিল। এরপর আবার আমাকে বোলনা যেন আধঘণ্টা কেটে গেলে স্টোলার দলবল নিয়ে আসবে তোমাকে উদ্ধার করতে।

দিয়েত্রিচ থামলো। মনে মনে ভাবলো। আবার বললো, আমি কাগজপত্র পড়েছি। বি. এন. ডি. কমিশনার বন-এ উড়ে যাচ্ছে। নির্বাচনে আমার জেতার সাক্ষী।

–তোমার পরাজয়। মার্টেল বলল।

–এই যে বেজন্মা শখের গোয়েন্দা, জার্মানীর রাজনীতি তুমি কি বোঝ? তুমি আশা করোনা এখান থেকে বেঁচে ফিরবে, কোন প্রমাণ আছে তুমি এখানে আছো? আমি ভেবে পাচ্ছিনা কেন তুমি এখানে...?

মার্টেল ওর চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি কিছুই পারবেনা দিয়েত্রিচ...।

ঘরের আবহাওয়া পাল্টে গেল। ঘরের প্রত্যেকের ওপর ও নজর রাখছিল। ভিনজ যেন নার্ভাস হয়নি এরকম ভাব দেখিয়ে পায়চারী করছিল। ক্লারাকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। দিয়েত্রিচ আবার ফেটে পড়ল, বেজন্মা, তুমি কি বলছে...।

মার্টেল স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলল, তুমি এমন একজনকে বিশ্বাস কর যে তোমার সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। তা না হলে স্টোলারের পক্ষে ডেলটা অস্ত্রাগার খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। ইনফরমার...।

ভিনজ উত্তেজিত হয়ে, হাতে লুগার, মার্টেলের দিকে লক্ষ্য করে বলল, তোমার দাঁতগুলো আমরা একটা একটা করে।

দিয়েত্রিচ গ্রাহ্য না করে ভিনজের গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে বলল, বেরিয়ে যাও।

ভিনজ কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। মার্টেল আবার আরম্ভ করলো, দিয়েচি, এমন একজন লোক তোমার অস্ত্রাগার চেনে, যে স্টোলারের ইনফরমার। সুতরাং ও তোমার নির্বাচনের আগে ক্ষতি করতে পারে।

হঠাৎ দরজা খুলে একজন প্রহরী ঢুকলো, দিয়েত্রিচ জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার কার্ল?

–গেটের সামনে একটা কনভয় এসেছে। সম্ভবতঃ পুলিশ।

দিয়েত্রিচ দুজনকে ডেকে বললো, একে সার্চ করে গুপ্তঘরে ঢুকিয়ে দাও। সাবধান, এর কণ্ঠস্বর যেন কারোর কানে না যায়।

বলেই সামনের বুককেসের দিকে এগিয়ে বোম টিপল। একটা অংশ তৎক্ষণাৎসরে গেল।

–ওঠো। কার্ল রিভলভার ঠেকিয়ে বলল। মার্টেল লক্ষ্য করেছে ঐ ফাঁকা অন্ধকার জায়গায় একটা গুপ্তঘর আছে আর তার সামনে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে।

মার্টেল এগোল। দুপাশে গার্ড।

দিয়েত্রিচ বলল, এখন তোমাকে ঐ গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, কাল কথা হবে।

সিঁড়ির নীচে পাথরের গুপ্তঘরে ধাক্কা মেরে কার্ল ওকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

বি. এন. ডির কনভয়। তিনটে কালো মার্সিডিসের ভেতরে সাদা পোষাকের সশস্ত্র কিছু লোক। প্রহরী ভয় পেয়ে কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিতেই কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ার অবস্থা। কুকুরগুলোকে গুলি করার নির্দেশ দিল স্টোলার। গুলি চলল।কুকুরগুলো রাস্তার ধারে পড়ে রইল। স্টোলার গাড়ি থেকে নেমে বলল, গেটের যোগাযোগ ছিন্ন করে দাও।

দুজন দৌড়ে ভেতরে গেল। একজন প্রহরীর হাতে রিসিভার দিয়েত্রিচকে মূল বিল্ডিং-এ ফোন করছিল। স্টোলার এর লোকেরা হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে আছড়ে ফেলল। স্টোলারের লোকজন অঞ্চলটা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

এরপরে স্টোলারের গন্তব্যস্থল দিয়েত্রিচের মূল বাসস্থান। তিনটে গাড়ি এগোতে লাগল। দিয়েত্রিচ একেবারে ওপরে দাঁড়িয়েছিল। ওখান থেকে চীৎকার করল, আমি যদি নির্বাচিত হই, তবে তোমাকে আমি লাথি মেরে ব্যাভেরিয়া থেকে তাড়াবো।

–তোমার নামে ওয়ারেন্ট...।

দিয়েত্রিচ হলে ফিরে এলো। পেছনে স্টোলার। ও দেখল ডানদিকের দরজা দিয়ে লাইব্রেরিতে ঢোকা যায়। সোফায় একজন মহিলা বসে আছে। স্টোলার ওর নাম জিজ্ঞেস

করল। দিয়েত্রিচ দ্রুত ওকে গিয়ে বলল, তোমার নামে আমি মিনিস্টার প্রেসিডেন্টের কাছে অভিযোগ করবো জানো?

–ফোন তো নেই। স্মিত হাস্যে আবার মহিলাটির দিকে তাকিয়ে, আমাদের সার্চ করার ক্ষমতা আছে। তোমার নামটা যদি...।

দিয়েত্রিচের নিষেধ অমান্য করে মহিলাটি বলল, আমার নাম ক্লারা বেক। আমি মিঃ দিয়েত্রিচের সেক্রেটারী আর পি. এ.। বলো তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি।

–এখানে ফিলিপ জনসন নামে একজন এসেছে। সে কোথায় জানাতে পারো?

ক্লারা বেকের নাম ও শুনেছে। হাউস্টব্যানহফের ফোন বুথে। ওর ফাইল আছে।

ক্লারা বলল, ও নামের কাউকে জানিনা।

দিয়েত্রিচ চীৎকার করল, কি ব্যাপার, এসব বন্ধ হবে কিনা।

স্টোলার গ্রাহ্য না করে সারা ঘর দেখতে লাগল, তল্লাসী চলতে থাকল আর ক্লারাকে মাঝে মাঝে জেরা করতে লাগলো। উত্তরে ক্লারা জানালো, ওর স্টার্টগাটে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ছিল।

ক্লারার ঠোঁটে সিগারেট। মৃদু হাস্যে ও যেন স্টোলারকে আহ্বান জানাচ্ছে।

একজন ঘরে ঢুকতেই স্টোলার জিজ্ঞেস করল, পিটার কিছু পাওয়া গেল। ও মাথা নাড়াল আর বলল, ক্যামেরা, এছাড়া সহকারী পাইলটের ফিল্ডপ্লাস। ফিল্ম, নেওয়া গেছে। ডেভেলপ করলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেছ?

-হেলিকপ্টারের ভেতরে জনসন ছিল। সিনে ক্যামেরাতে সব কিছুই উঠেছে। সিগারেট খাবে দিয়েত্রিচ? তুমি কি সিগারেট খাও?

–হাভানা। ছটফট করতে করতে উত্তর দিল।

স্টোলার বুক কেসের দিকে এগোল। কার্পেটে আধপোড়া সিগারেট দেখে তুলে দেখল। এটা একেবারে আলাদা। এটা এখানে কেমন করে এলো।

বুককেস থেকে বইগুলো মেঝেতে ফেলতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লাল বোতাম। বোতামটা টিপতেই খানিকটা অংশ নেমে গেছে। পিটারকে নামার নির্দেশ দিলো। ঘরটা ভালভাবে দেখতে লাগল পিটার কিছু পরে ফিরে এলো। বললো, একটা ঘরের মধ্যে ওকে জঘন্য ভাবে আটকে রাখা হয়েছে। বাইরে থেকে তালা।

স্টোলার দিয়েত্রিচের দিকে তাকিয়ে বললো, কি ব্যাপার দিয়েত্রিচ?

–ও, একজন প্রতারক। আমি নিশ্চিত ও আমাকে খুন করতে এসেছিল। আমি খোঁজ নিয়েছি। শত্রু আমার অনেক।

মার্টেলকে সেই গুপ্তঘর থেকে মুক্ত করা হলো। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

বি. এন. ডির তিনটে গাড়ি গেটের সামনে এসে পৌঁছালো। এখন গন্তব্যস্থল মিউনিখ।

স্টোলার মার্কেলের দিকে তাকিয়ে বলল, হফারকে তুমি, যেখানে ছেড়ে দিলে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা হয়। ও সব বলল আমাকে। কিন্তু তুমি এখানে এলে কেন?

-ওকে বোঝাতে যে, ওর দলের লোকেরাই বিশ্বাসঘাতক। এতে করে ওদের অপারেশন ক্রোকোডাইল এলোমেলো হয়ে যাবে। এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।

মার্টেল মিউনিখে ক্লেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে চলেছে। স্টোলারের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। ওরা বনে যাবার প্লেন ধরতে গেল।

সম্ভাব্য খুনীর তালিকা থেকে স্টোলারকে বাদ দিতে পারিনা এখন?

ক্লেয়ার বলল, কেন বলতো?

দিয়েত্রিচের খপ্পর থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছে বলে?

মার্টেল বলল, এও তো হতে পারে আসল খুনীর দিক থেকে আমার চোখ সরিয়ে দেবার জন্যে এসব ওর সাজানো ঘটনা। যাতে ওকে এব্যাপারে সন্দেহ...। এখনও আমার তালিকায় এরিখ স্টোলার রয়েছে। গাড়ির গন্তব্যস্থল মিউনিখ বিমানবন্দর।

***

মঙ্গলবার, দোসরা জুন

বেলা দুটো থেকে দশটা।

নাম : এরিখ হেইনজ স্টোলার।

জাতি : জার্মানি।

জন্মতারিখ : সতেরই জুন, উনিশশ পঞ্চাশ।

জন্মস্থান : পলিজিতে।

উনিশশ চুয়াত্তর বি. এন. ডিতে, তারপরে পূর্বজার্মানীর মধ্যে আন্ডারভার এজেন্ট হিসেবে উনিশশ পঁচাত্তর-সাতাত্তর পর্যন্ত। উনিশশ আটাত্তর-এ বি. এন. ডির প্রধান।

টুইড কালচে লাল ফাইলটা ভালভাবে পড়ে ম্যাকনেইলকে জিজ্ঞেস করল, স্টোলার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? তুমি কি কখনই ওকে দেখনি, এটা একটা সুবিধে, সুতরাং...।

–ও হচ্ছে চারজনের মধ্যে সবচাইতে তরুণ। বি. এন. ডি তে খুবই অল্প বয়েসে তাই না?

-চ্যান্সেলার ল্যাংগার প্রমোশন দিয়েছিল। ওর মতো ব্রিলিয়ান্ট।

সামনের একটা ফোল্ডারে সমস্ত কিছু প্রস্তুত করে রেখেছিল ম্যাকনেইল। মার্টেল হয়ত এর মধ্যেই অনেক কিছুর হদিশ পাবে। মিউনিখে ফোল্ডারটা নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সবগুলোই গোপনীয় ও জরুরী। টুইড ম্যাসনকে ফোন করে বলে দিল ওর ওপর নির্ভর করা চলে। স্পেশাল সিকিউরিটি ব্রিফকেসে ম্যাকনেইল সমস্ত ফাইলগুলো ঢুকিয়ে রাখলো। ওর ছোট্ট ব্যাগটাতে আগেই জিনিষপত্র ঢোকানো হয়ে গেছে।

***

ঠিক ছটা বেজেছে।

স্থানঃ মার্কিন দূতাবাস, গ্রসতেনর স্কোয়ার। তিনতলার অফিসে টিম ও'মিয়েরা দাঁড়িয়ে পাশে ডেপুটি জেমস ল্যান্ডিস রিসিভার হাতে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। রিসিভার রাখতেই মিয়েরা জিজ্ঞেস করল, ঠিক আছে?

আটলান্টিকের ওপরে এয়ার ফোর্স ওয়ান ঠিক সময়েই থাকছে। তারপর ঠিক সময়েই ওরলিতে পৌঁছাবে। ওখান থেকে প্রেসিডেন্ট সোজা গেয়ার দ্য-ইস্ট। তারপর সামিট এক্সপ্রেস...।

–তাহলে আমাদের এখন ওরলিতে যাওয়া জরুরী প্রয়োজন।

ডেপুটি বলল, স্যার, ক্লিন্ট লুমিসের ঘুমের ব্যাপারে একটা সন্দেহজনক রিপোর্ট...

ওর কথার মাঝখানে ও'মিয়েরা বলল, এখন চল...।

***

ঠিক ছটা। এলিসি প্রাসাদ, প্যারিস।

প্রবেশ পথের বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস সমস্ত কিছু তীক্ষ্ণ নজরে রাখছে। এন্টিবোম্ব স্কোয়াডের দিকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গাড়িতে ফরাসী প্রেসিডেন্ট গেয়ায়-দ্য-ইস্টে যাবে। ফ্ল্যান্ড্রের কাউকে বিশ্বাস করেনা।হঠাৎ আয়নায় দুজনকে দেখা গেল। একজনকে চেঁচিয়ে বলল, গাড়ির সবকিছু তল্লাসী কর, এমনকি নীচেও।

এরপরে ও নিজে ছুটে এলিসি প্রাসাদের অপারেশন রুমে ঢুকে গেল। দুজন লোক শক্তিশালী ট্রানসিভারের ওপর ঝুঁকে আছে আর তৃতীয়জনের দৃষ্টি ক্রিপটোগ্রাফারের দিকে। সংকেত আদান প্রদান হচ্ছে।

ফ্ল্যান্ড্রেসকে দেখেই ওর হাতে খবরের কয়েকটা গোছা দেবার চেষ্টা করলো। ওকে জানানো হলো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এগারোটায় ওরলিতে পৌঁছেছেন।

–তাহলে বিমানবন্দর থেকে ট্রেনে যেতে দেড় ঘন্টার মত সময় লাগবে। সব চেয়ে ভাল হবে রুটগুলো সমস্ত বন্ধ করে দিলে। তাহলে ব্যাপারটা এলোমেলো হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে আমেরিকান স্টাইল।

–ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্পেশাল ফ্লাইটে চার্লস শ্যেগল-এ পৌঁছোচ্ছে ঠিক দশটার সময়।

একটু থেমে বলল, আগামীকাল সকাল নটা তেত্রিশে জার্মান চ্যান্সেলার মিউনিখের হাউপ্টব্যানহফে এক্সপ্রেসে...।

–এটা আমি জানি। ফ্ল্যান্ডেস বলল।

–কিন্তু বন থেকে একটা অদ্ভুত সিগন্যাল আসছে। ব্যাপারটা দুর্বোধ্য। কিপটোগ্রাফার ওকে জানাল।.

ফ্ল্যান্ড্রেস ঘর ছেড়ে করিডোরে গেল। বনের সিগন্যাল...সিগন্যাল। ওর উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে।

***

ঠিক ছটা। স্থান চ্যান্সেলারী বনশহরের কিছুটা দূরে ছোট্ট শহরের আধুনিক বিল্ডিং। ল্যাংগারের সব দেখা শেষ হতে স্টোলারের মুখে প্রশান্তির হাসি।

মিউনিখ থেকে হেঁটে আসছে। অসুবিধা হয়নি।

স্টোলার এলিসি প্রাসাদে কোড সিগন্যাল পাঠিয়েছে। হেড কোয়ার্টার ওখানেই। রয়েছে ফ্ল্যান্ড্রেস। সুতরাং চিন্তার কারণ নেই। এরপর ট্রেন যখন ছাড়লো দ্বিতীয় সংকেত পাঠালো।

স্টোলার ভাবল, কাজ প্ল্যানমাফিকই এগোচ্ছে...।

ট্রেন তখন চলেছে গন্তব্য অভিমুখে।

ছটা। হিথরো বিমান বন্দর। ফ্লাইট এল এইচ তিনশ সাঁইত্রিশ মিউনিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। শেষ মুহূর্তে দুজন যাত্রী প্রথম শ্রেণীর সীটে বসেছে। স্পেশ্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট।

ম্যাকনেইল আর ম্যাসন সাধারণ চ্যানেলেই যাচ্ছিল। ওরা অফিসের মধ্যে ছিল। এরপর যখন ওরা এয়ারপোর্টের দিকে এগোলো, একজন মহিলা ওদের সীটের কাছে নিয়ে গেল। ভি. আই পি দের এটাই ভাল। ম্যাকনেইল বিড়বিড় করে বলল। বিমান উড়ে চলেছে।

ঠিক সাড়ে সাতটা। হিথরো বিমানবন্দর। নির্ধারিত সময়েই ফ্লাইট বি. ই ০২৬ প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ম্যাকনেইল জেনেছে হাওয়ার্ডও একই ফ্লাইটে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করছে।

শেষ মুহূর্তে টুইড বিমান ধরতে পেরেছে। সামনে তাকালো টুইড। হাওয়ার্ড-এর মাথার পেছনটা দেখা যাচ্ছে।

বিমান এল. এইচ, ০৩৭ ফ্লাইটের বিমান যে মুহূর্তে জার্মানীর সীমা অতিক্রম করছে ম্যাসন ম্যাকনেইলকে বলে উঠল, আমরা এই ফ্লাইটে যাচ্ছি এটা মার্টেলকে জানানো প্রয়োজন। পাইলট রেডিওতে...।

–কিন্তু ও তো আমাদের আশা করছে। ম্যাকনেইল বলল।

–হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা জানানোই উচিত। কোন সুযোগ, ম্যাসন বলল। পরিচয়পত্র দেখিয়ে পাইলট কেবিনে ঢুকে ওয়ারলেস অপারেটরের দিকে তাকালো। পাইলট ঠিক আছে জানাল। এজেন্ট প্যাডে খবরটা লিখতে বলল। মিউনিখ টেলিফোন নাম্বারে ফোন করতে হবে। কোড নামে সই করা আছে। অপারেটর সবটা পড়ল। ও কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

– টেলিফোন নাম্বার মিউনিখ। ম্যাকনেইল আর আমি...গুস্তাভ?

সংকেত সম্ভবতঃ ঠিক জায়গাতে পৌঁছেচ্ছে। সেই সঙ্গে বিমানও।

মিউনিখের অ্যাপার্টমেন্টে একটা গ্লাভস পড়া হাত রিসিভারটা তুলল।ও প্রান্তের মহিলা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। ম্যাকনেইল আর আমি ফ্লাইট...।

ধন্যবাদ জানিয়ে ম্যানফ্রেড ফোন রেখে, আবার তুলে ডায়াল করল। ও প্রান্তে এডুইড ভিনজ

–তুমি এয়ারপোর্টে একটা টীম নিয়ে যাও।

সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল। এরপর ও ঘড়ি দেখল। ভি নিশ্চয় ঠিকসময়ে পৌঁছে যাবে। ম্যাসন এখন কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে। দুজনের শেষ হওয়া দরকার।

–পুরুষ নারী দুজনকে হত্যা করো।

***

মিউনিখ বিমানবন্দরের বেরোবার মুখে একটা বুকস্টলে মার্টেল দাঁড়িয়েছিল। অন্যপ্রান্তেকালো চশমা চোখে ক্লেয়ার।

অবশেষে বিমান নেমেছে। সুটকেশ হাতে ম্যাকনেইলকে মার্টেল দেখতে পেল। পাসে ম্যাসন। খানিকটা এগিয়ে দুজনে আলাদা হয়ে যেতেই মার্টেল বিস্মিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্লেয়ারকে ও সংকেত করলো। ম্যাকনেইলকেও চিনতে পেরেছে। ক্লেয়ার মার্টেলকে দেখে বুঝল কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

ব্যাগের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরলো। সুটকেস হাতে ম্যাকনেইল এগিয়ে আসছে। পাইলটের ইউনিফরম পরা লোক হঠাৎ সাইলেন্সার পিস্তল বের করেছে। মার্টেল চীৎকার করে ম্যাকনেইলকে শুয়ে পড়তে বলল। ক্লেয়ার সতর্ক। সঙ্গে সঙ্গে ও শুয়ে পড়ল। মার্টেলের বুলেট ভিনজের পিস্তল লক্ষ্য করে কয়েকবার ছুরতে ভিনজ মেঝেতে পড়ে স্থির হয়ে গেল। পাইলটের ইউনিফরম পরা লোকটার লক্ষ্য ম্যাসন। সিগারেট মেশিনের কাছে ও দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বুলেট ছুটে এসে অ্যালেনের পেছনে লাগলো। মেশিনের ওপর পড়ে ম্যাসন নিশ্চল হয়ে গেল। ক্লেয়ারের পিস্তলের গুলি ম্যাসনের হত্যাকারীকে শেষ করে দিল। মার্টেলের চীৎকার শোনা গেল ম্যাকনেইল শুয়ে থাকো।

তিনজনের টীম, প্রত্যেকের হাতে হ্যান্ডগান। সমস্ত জায়গাটায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ পরপর গুলির শব্দে তিনজন লুটিয়ে পড়ল।

***

ক্লসল হোটেলে ওরা তিনজন। ম্যাকেনেইল, ক্লেয়ার আর মার্টেল। ম্যাকনেইলের দেওয়া ফটোকপি মার্টেল দেখছিল।

মার্টেল জানালো ম্যাসনই ম্যাকনেইলকে গুম করাতে চেয়েছিল। নিজের ফঁদে নিজেই পড়ল। ও নিশ্চয়ই টুইডের অফিসে গিয়েছিল। ওর পরনেই উইচিটারের পোষাক ছিল। তারপর অস্টিন রীডের চেয়ারে সবকিছু ফেলে রেখে...।

আসলে সমস্ত কিছুই আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যে। ম্যাসন বরাবর টুইডকে অনুসরণ করে ম্যানফ্রেড়কে জানিয়েছে। ফাইল দেখা শেষ করে মার্টেল কাগজে একটা কিছু লিখে ম্যাকনেইলকে দেখালো। ও পড়ে ছিঁড়ে ফেলল। তারপরে বললো, তুমি নিশ্চয়ই টুইডকেও বিশ্বাস করো না।

–দেখা যাক। আমি এখন একটু অন্য জায়গায় যাবো। দরজায় পাহারা আছে। ভয় নেই।

***

দোসরা জুন

রাত সাড়ে আটটা থেকে এগারোটা পঁয়ত্রিশ।

চার্লস দ্যগল বিমানবন্দর। সাড়ে আটটা। বি. ই ০২৬ ফ্লাইট সঠিক সময়ে অবতরণ করলো।

হাওয়ার্ড নামলো। গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে ফ্ল্যান্ড্রেস।

ফ্ল্যান্ড্রেসের নির্দেশেই ফরাসী নিরাপত্তা বিভাগ ও রিলি আর চার্লস দ্যগলে চেকিং জোরদার করেছে। চেনা মুখও বাদ পড়ছে না। কিন্তু একজনকে ওরা মিস করে গেল। সে এল. এইচ ৩৭ ফ্লাইটে মিউনিখ থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে আসছিল। চার্লস দ্যগলে নামল দশটা পনেরোতে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের সিকিউরিটি বিনা তল্লাশীতেই ছেড়ে দিল।

মহিলাটির পোষাক কালো। গলায় মুক্তোর হার, মাথায় টুপী। মহিলাটির গোটা মুখ আবৃত। পাসপোর্ট কন্ট্রোল একবার আবরণটা খুলে দেখল। তারপর ও বেরিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো, এমিল ট্রেন ছাড়ার একঘণ্টা বাকি। আস্তে চালাও। সামিট এক্সপ্রেস ছাড়ার ঠিক পাঁচমিনিট আগে আমি পৌঁছতে চাই।

মহিলাটি স্বয়ং ক্লারা।

গেয়ার দ্য ইস্ট।এগারোটা। স্টেশনে বারো কোচের এক্সপ্রেসটা দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রধান ইঞ্জিন ড্রাইভার চেক করে নিচ্ছিল। কেবিনও চেক করে নিল।

ইঞ্জিনের পেছনের ছটা কোচ সংরক্ষিত। গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী লোকোমোটিভের পেছনের কোচে।

দ্বিতীয়টায় রয়েছে ফরাসী প্রেসিডেন্ট।

অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস দাঁড়িয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ঢোকার পরে ওর মুখমণ্ডলে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে।

ফ্ল্যান্ড্রেস পাশের বুজারকে উদ্দেশ্য করে বলল, সামনের রাতটা অত্যন্ত দীর্ঘ, বুঝেছো।

তিন নম্বর কোচ অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্টের জন্য সংরক্ষিত। ওরলি থেকে ওর ওঠার কথা। চার নম্বরটা চ্যান্সেলার ল্যাংগারের জন্যে। তার পরেরটা যোগাযোগ রক্ষাকারী। একটা সেকশান পুরোটাই হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে রাখা হয়েছে। নিউক্লিয়ার সংযোগ ব্যবস্থা সুরক্ষিত। একটা রেস্তোরাঁ কারও যুক্ত আছে। সবারই একসঙ্গে আলোচনা করার কথা। চতুর্দিকে কড়া পাহারা।

খানিক পরেই ও'মিয়েরা এসে নামলো। স্টেশনে ঢুকতে না ঢুকতেই আমেরিকান নিরাপত্তার লোকেরা গাড়িটাকে ঘিরে ফেলল।

ট্রেন ছাড়তে মিনিট তিনেক বাকি। ঠিক সেই সময়ে একটা লিমুসিন গাড়ি দ্রুতবেগে স্টেশনে ঢুকল। এক মহিলা নেমে টিকিট দেখিয়ে ঢুকলো। পাসপোর্টটা ভুলে গেছিল। শোফার নিয়ে এল ওটা। মহিলাটি জাতিতে সুইস। হাওয়ার্ড দূর থেকে মহিলাটিকে লক্ষ্য করছিল। কেতাদুরস্ত মহিলা ট্রেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে কোচে। ঠিক তারপরেই হাওয়ার্ড ঢুকলো।

এরপরেই একটা ক্যাব এসে থামল। একজন চশমা, টুপী পরিহিত ব্যক্তি নেমে ভাড়াটা মিটিয়ে দিল। হঠাৎ সেই যাত্রীকে দেখে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফরমে নেমে বলল,

টুইড। তুমি এখানে কেন, এখানে তোমার আসা নিষিদ্ধ, তা বুঝি জানো...।

–তোমার বলার কোন অধিকার নেই, টুইড কার্ডটা দেখাল। ততক্ষণে ও'মিয়েরা এসে দাঁড়িয়ে বলল, কি হচ্ছে এখানে?

দূর থেকে ফ্ল্যান্ড্রেসও এগিয়ে আসছে, মিয়েরা পাসপোর্ট দেখে অবাক। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর। হাওয়ার্ড ফেটে পড়ল। আমি তো এসব জানি না।

টুইড বললো, কারণ জানানো নাও হতে পারে।

ফ্ল্যান্ড্রেস ততক্ষণে টুইডকে হাত ধরে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো। ওর সঙ্গে টুইড প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলো।

ফ্ল্যান্ড্রেস বলল, স্লিপিং কামরা। একজন সুইস মহিলা আছে।নাম ইরমা রোমার। তুমি একবার বার্নেতে ফার্দি আরন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নাও এই মহিলার পাসপোর্ট ও দিয়েছে কিনা কিংবা আদৌ ঐ নামের কেউ আছে কিনা।

সামিট এক্সপ্রেস দুলে উঠলো। গেয়ার-দ্য ইস্ট ছেড়ে এবার পূর্ব দিকের পথে।

এবারে ঐতিহাসিক ভ্রমণের শেষ পর্যায় অর্থাৎ ভিয়েনা। আর সাতশো মাইল দূর।

***

তেসরা জুন : একটা থেকে আটটা দশ

টুইড জানলো হেইসের কাছে কোনরকম অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে কিনা।

টুইডের প্রশ্নে সহকারী হেইস খানিকটা বিব্রত বোধ করল।

এক্সপ্রেস প্যারিস থেকে নব্বই মাইল দূরে। গতি ঘণ্টায় আশি। টুইডকে প্রথমটায় উপেক্ষা করতে হেইসকে ও পরিচয় জানালো।

হেইস ওকে জানাল, স্টোলার নাকি নিরুদ্দেশ। যখন ও এলিসিতে ছিল তখন ফ্ল্যানড্রেসের কাছে বন থেকে এই সতর্কবার্তা এসেছে।

হেইস আবার জানালো, কোথায় ওকে পাওয়া যাবে কে জানে। টেলিপ্রিন্টারে নিশ্চয়ই।

হাওয়ার্ড এদিকে টেলেক্সে পাওয়া খবর অকস্মাৎটুইডকে জানালো, তোমার খবর পাওয়া গেছে ফার্দি আরন্ডের কাছ থেকে। ইরমার পাসপোর্ট চারবছর আগে ওখানে ইস্যু করা হয়েছে।

ও'মিয়েরা ততক্ষণে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাওয়ার্ড ওকে দেখে চীৎকার করে উঠল, তুমি কেন এখানে?

ও'মিয়েরা একবার জিজ্ঞেস করল, ব্রিটিশ সিকিউরিটির চার্জে কে আছে? হাওয়ার্ড না টুইড?

টুইড বলল, এই মুহূর্তে চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণভার ফ্ল্যাড্রেসের হাতে। আমরা ফরাসী অঞ্চল অতিক্রম করছি।

ট্রেন ছুটে চলেছে। কেউই ঘুমোয়নি। ও'মিয়েরা সিগারেট টানছে। টুইড স্টোলারের নিরুদ্দেশ নিয়ে ভাবছে।

ট্রেন জার্মানীর কেল-এ পৌঁছাতে টুইড সোজা হয়ে বসল। ক্লার্কের কাছে খবরটা চাইল। ও'মিয়েরা ঠিক সেই সময়ে জেগে বলল, কি ব্যাপার?

ও মোটেই ঘুমায়নি। পিস্তল উঁকি মারছে। ইতিমধ্যে হাওয়ার্ডও এসে পড়ল। ল্যাংগার সামিটে উঠবেন কেল থেকে। আবার জানাচ্ছি কেল মিউনিখ নয় কেল স্টোলার।

–ও যে দুঃস্বপ্ন, ব্যাপারটা কি? হাওয়ার্ড বলল। অন্য তিনজন সিকিউরিটি চীফও রয়েছে। ফ্ল্যানড্রেস এসে যুক্ত হলো।

ট্রেনের গতি মন্থর হলো। কেল-এ থামল।

ফ্ল্যাড্রেস চারনম্বর দরজা খুললো। ঠিক সেই মুহূর্তে ল্যাংগার ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ফ্ল্যান্ডেস গার্ডকে সংকেত দিয়ে দরজা বন্ধ করল। ট্রেন চলতে আরম্ভ করলো। এবার ব্যাভেরিয়াগামী।

ফ্ল্যানড্রেস সবাইকে জানাল, স্টোলারের খবর চ্যান্সেলার দিতে পারলো না।

হাওয়ার্ডের এবার ডিউটি আরম্ভ হবে। টুইডের দিকে একবার তাকালো। টুইড সমস্ত কিছু দেখে যাচ্ছে।

বার্ণেতে দ্বিতীয়বার সিগন্যালে এসে থামল।

বিষয়। ইরমা রোমার।

উচ্চচা : পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি।

ওজন : একশ কুড়ি পাইন্ড।

চোখের রঙ : বাদামী।

পরিচয় : এক শিল্পপতির স্ত্রী।

নাম : এক্সোল রোমার।

বয়স : চৌত্রিশ বৎসর।

গন্তব্য : লিসবন, আর্নল্ড, বার্নে।

টুইড পড়ে হাওয়ার্ডের হাতে দিল। পড়ে বলল, ওর সঙ্গে মিলছে না।

ফ্ল্যান্ডেস বলল, এখুনি যাওয়া দরকার স্লিপার কোচে। পরে জানা গেল। ইরমা রোমার ভাল লাগছেনা এই কারণ দেখিয়ে স্টার্টগাটেই নেমে গেছে। স্টার্টগাটেই...পৌঁছানোর সময় ছটা একান্ন মিঃ, ছাড়বার সময় সাতটা তিন। মাত্র বারো মিনিট স্টপেজ। প্রতি স্টপেই লক্ষ্য রাখা হচ্ছে কে নামছে, কে উঠছে, সমস্ত কোচগুলোতেই।

প্রথম শ্রেণীর ডেকোচে এক মহিলা যাত্রী নিবিষ্ট মনে অ্যামেরিকান ভোগ-এর একটা কপি পড়ছিল।

পরিষ্কার করে চুল আঁচড়ানো। চোখে চশমা, আমেরিকান পোষাক পরণে।

মহিলার পাসপোর্ট অ্যামেরিকান। পেশা উল্লেখ আছে, সাংবাদিক। তাহলে, ভালো লাগছে না এই কারণ দেখিয়ে নেমে যাওয়া মহিলাটি হচ্ছে আসলে দিয়েত্রিচের মিসট্রেস স্বয়ংক্লারা বেক? বর্তমানে সাংবাদিক।

সাংবাদিক পামেলা ডেভিস। স্টার্টগার্ট স্টপে অ্যাটেনডেন্টের চোখে ধূলো দিয়ে টয়লেটে গিয়ে ছদ্মবেশটা ঠিকঠাক করে নিয়েছিল। আসলে ও ট্রেন থেকে মোটেইনামেনি। টয়লেটে কালো চুলের ওপর সাদা চুলের উইগ পড়েছিল। সুটকেশে ছিল দামী পোষাক। ঠিক পোষাক পড়ে নিয়েছিল। তারপর সুটকেস বন্ধ করেছিল। ওটাকে ফেলে দেওয়াই সব চাইতে উপযুক্ত।ইরমার পাসপোর্টের জায়গায় ব্যাগে পামেলা ডেভিসের পাসপোর্টটা রেখেছিল ও। ব্যাগে ভিয়েনা যাবার একটা টিকিট ছিল।

পামেলা অর্থাৎ ক্লারার চোখে কিছুই এড়ায়নি। এখন ও অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত। বলা যায় শেষ পর্যায়।

উলম এ স্টপেজ দু-মিনিট। টুইড প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে। হফারকে ওর চিনতে অসুবিধে হয়নি। মার্টেল শুধু যে সুইস মহিলার কথাই বলেছে তা নয়। স্পেশাল কার্ডের সঙ্গে পাশপোর্ট ফটোও দিয়েছে।

সামিট এক্সপ্রেস আসার আগে থেকেই ক্লেয়ার প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করছিল। হাতে সুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ। চোখে চশমা। ট্রেন থামতেই ওয়েটিং অফিসিয়ালকে টিকিট দেখাল। উঠবে প্রথম শ্রেণীর কোচে। কামরা ফাঁকা। দূরে একজন মহিলা বসে। ওর নাম পামেলা ডেভিস।

–আরে কি সৌভাগ্য মিস হফার। ও প্রায় লাফিয়ে উঠল। হ্যান্ডব্যাগ থেকে পিস্তলটাও বের করেছে ততক্ষণে। ঠিক সেই সময়ে লম্বা লোকটা নরম স্বরে বললো, ভয় নেই। আমি ক্ষতিকর ব্যক্তি নই। ও সবিস্ময়ে দেখল এরিখ স্টোলার। এক্সপ্রেস পূর্বদিকে যাত্রা আরম্ভ করেছে।

***

তেসরা জুন, বুধবার।

সময় আটটা থেকে আটটা পঁয়তাল্লিশ মি.।

ব্রেজেঞ্জে ক্যাব ড্রাইভারকে রুমনস্ট্রাসে সমাধি-তে নিয়ে যেতে বলল। তাড়াতাড়ি।

সমাধি ক্ষেত্রে এসে সমাধি ফলকগুলো দেখে ও খানিকটা বিভ্রমে পড়ল। আজই তো ঠিক দিন। ঘড়িতে সকাল আটটা। প্রতি সপ্তাহে এই দিনে, এই সময়ে আসে ও।

বৃষ্টিতে রেনকোটটা ঠিক করে নিলো।

হঠাৎ মার্টেলের চোখে পড়ল, এক মহিলা মাথায় লাল রুমাল, হাতে একগুচ্ছ ফুল সমাধি ফলক গুলির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। মহিলা যে ফলকটির কাছে দাঁড়ালো তাতে লেখা আছে অ্যালাইস স্টোর, ঊনিশশ ত্রিশ ঊনিশশ তিপ্পান্ন। মার্টেল ওর পিছনে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালো।

ফুল দিয়ে মহিলাটি পেছন ঘুরতেই মার্টেলের মুখোমুখি। মার্টেল বলল, ভয়ের কিছু নেই। নিজের পরিচয় দিল ভিয়েনার সিকিউরিটি পুলিশ। অ্যালাইস স্টোরের সম্বন্ধে কিছু তথ্যের প্রয়োজন।

মহিলাটির পুরোন বন্ধু অ্যালাইস। তিরিশ বছর আগে মারা গেছে, যখন ফরাসী সৈন্যরা ডোরালবার্গ অধিকার করেছিল। মহিলাটির চোখে সতর্কতার আঁচ পেল মার্টেল। ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে, আর কথা সম্ভব নয় বলে চলে গেল।

***

ব্লুমস্টাসেতে বড় ভিলা। দরজায় আটটা নাম। প্রত্যেকের নামের পাশে বেল পুশ। মার্টেল দরজা খুলতে যে নামটা দেখলো তা ক্রিশ্চিনা ব্র্যাক।

মহিলার সঙ্গে কথাবার্তায় যা জানা গেল তা হল : মিঃ স্টোর বলে এক ভদ্রলোককে ও ভালবাসতো। কিন্তু বিয়ের পরই ও মারা যায়। দুজন সিকিউরিটির লোক এসে ওকে খবরটা দেয়। ওদের পরণে সিভিল পোষাক ছিল। ওরা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিল যে ব্যাপারটা গোপন কারণ ওর স্বামী দীর্ঘদিন ধরে সোভিয়েট বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত ছিল। ও লেফটেন্যান্ট ছিল। মৃত্যুর পর নিয়মিত পেনস ও পাচ্ছে। মৃতদেহ শনাক্ত করেছিল মহিলাই। তারপর ওকে অন্য নামে সমাধিস্থ করা হয়। কারণ সোভিয়েট বিরোধী অপারেশনে ঐ নামটা জীবিত রাখার প্রয়োজন ছিল।

মার্টেলের মনে পড়ল ওরা দুটো খুন করেছিল। একজনের ঘাড়টা ভাঙ্গা ছিল আর দ্বিতীয়জনের দেহটা লেকের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। মার্টেল একটা সম্প্রতি ভোলা ফটো মহিলাটিকে দেখাতেই ক্রিশ্চিনা নিথর হয়ে গিয়ে বলল, এতো আমার স্বামী, মিঃ স্টোর। ব্যাপারটা তো কিছুই...।

মার্টেল শান্তভাবে জানালো, এ তোমার স্বামী নয়। অনেকটা ঐরকম দেখতে। তোমার স্বামী। তিরিশ বছর আগেই মারা গেছে।

উঠে দাঁড়ালো মার্টেল, বলল, তোমার সামনে এখন একটা বিপদ আসছে। তুমি বরং আমার সঙ্গে কয়েকদিন নিরাপদ জায়গায়...।

মার্টেল ক্রিশ্চিনাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে ড্রাইভারকে ক্যাব নিয়ে কাছাকাছি এয়ারস্ট্রিপ এ নিয়ে যেতে বলল।

প্রথমে ওর হাউপ্টব্যানহফ-এ যাওয়া প্রয়োজন। ওখানে ক্রিশ্চিনাকে একটা হোটেলে রাখা প্রয়োজন। তারপর...।

***

তেসরা জুন, বুধবার : মিউনিখ :

এক্সপ্রেস উলম ছাড়ার পর এরিখ স্টোলার কমিউনিকেশন কোচে উঠেছিল। হাওয়ার্ড তো রীতিমত ক্ষুব্ধ।

ওরা দুজন কমিউনিকেশন কোচের একটা বক্সে বসলো। এরিখ জানালো মার্কেলের সহকর্মী ক্লেয়ার হফার উলম এ ট্রেনে উঠেছে ফার্স্ট ক্লাসে। ব্যাপারটা কেমন যেন লাগছে। টুইড তাই জানালো ওর কাছে একবার যাওয়া প্রয়োজন। ওরা দুজনেই মার্টেল যে কোথায় আছে এই নিয়ে চিন্তিত। এরিখ জানালো চ্যান্সেলার ল্যাংগারই খুনীর লক্ষ্য। ব্যাভেরিয়ার নির্বাচনে, ক্রেমলিনের পুতুল টফলার নাজীদের ব্যবহার করে জনসাধারণকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে যাতে ভোট ওর পক্ষে যায়। সেই কারণেই ল্যাংগারকে সরানো প্রয়োজন। তাহলে ব্যাভেরিয়া উনিশশ উনিশ-এর মতো সোভিয়েটের হাতে চলে যাবে। মিউনিখেই ওকে খুনের ব্যবস্থা করেছিল, সেজন্যই স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু সম্ভাব্য খুনী কে? টুইড জানালো বলা একেবারেই সম্ভব নয়। এরিখকে নতুন ধরনের অ্যালার্ম ডিফাইজএনে দিতে বললো। যন্ত্রটা প্লাস্টিক বাক্সর মতো। শক্তিশালী টর্চ, আবার বোতাম টিপলে সাইরেনেরও কাজ করে। টুইড হাতে নিয়ে এগোল।

***

মার্টেলের গাড়ি ইসার নদীর পাশ দিয়ে চলেছে। ওখানেই স্টল বলে একজনের মৃতদেহ। পাওয়া গেছিল।

হাতের ঘড়িটায় লেখা ছিল, না হলে শনাক্ত করা অসম্ভব ছিল।

মার্টেল গাড়ি থেকে নেমে বাকিটা দৌড়ে এগোল। ঘড়িতে নটা তেইশ মিঃ। সুন্দর সকাল। স্টেশনে সামিট এক্সপ্রেস পৌঁছতে আর দশ মিনিট বাকি। চ্যান্সেলার যদি খুন হয় তাহলে টফলারের হাতে ক্ষমতা চলে যাবার সম্ভাবনা।

***

শব্দ হতেই ম্যানফ্রেডের হাত রিসিভারের দিকে গেল। অ্যাপার্টমেন্টের সামনে ওর প্যাক করা সুটকেশ রাখা।

কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, এওয়ার্ড পোর্টজ বলছি। আমি প্রস্তুত।

সময়টা ঠিক রাখবে।

ওদিকে মিউনিখের হাউপ্টব্যানহফে একটা ফোন বুথে পোর্টজ ফোন করছিল। তরুণ-যুবক। ফোনটা রেখে দিল।

এদিকে ম্যানফ্রেড সুটকেস হাতে নিয়ে দরজা বন্ধ করলো। হাতে গ্লাভস। পোর্টজ নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়ে আছে। যে মুহূর্তে প্রকৃত খুনী চ্যান্সেলারকে গুলি করবে, ঠিক সেই

সময়ে ও ফাঁকা আওয়াজ করবে। তারপর পালাবার ব্যবস্থা করবে। এই কৌশলে আসল খুনী পশ্চাতে থাকবে।

ফ্ল্যাড্রেসের গাড়ি পার্ক করা হল। চশমাটা ঠিক করে ও গুপ্ত গ্যারেজের দিকে রওনা হলো। ওখানেই দিয়েত্রিচের সঙ্গে ওর চূড়ান্ত আলোচনা পর্ব। শেষ প্রস্তুতি।

***

সমস্ত ব্যাপারটা হতাশাজনক। মার্টেলকে ট্রেনটা ধরতেই হবে। হাউপ্টব্যানহফে ট্রাফিক ব্যবস্থা জঘন্য। মার্টেল সামনের দিকে এগোতে লাগল।

ভিড়ের মধ্যেই দ্রুত এগোচ্ছিল। সময় ঠিক নটা একত্রিশ। সামিট এক্সপ্রেস পৌঁছতে আর দু-মিনিট বাকি।

মার্টেল দ্রুত স্টেশনে ঢুকল। চারদিকে পুলিশ কর্ডন। চ্যান্সেলারের জন্যে সবাই অপেক্ষমান। মার্টেল তাকালো। সামিট এক্সপ্রেস সবেমাত্র থামল। প্রাণপণে ছুটল ট্রেনের দিকে।

ক্লারাকে করিডর পেরিয়ে বাইরে আসতে দেখা গেল। হাতে সুটকেশ। হারের কামরার দিকে ও তাকালো না। হফার ওর যাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করতে লাগল। ওকে কোথায় দেখেছে! মনে পড়ল। বৈরিশ্চার হফের রিসেপশান হলে।

ক্লেয়ার প্লাস্টিক বাক্সটা হাতে নিয়ে কামরা থেকে নেমে ওর পিছু নিল। বেক খানিকটা এগিয়ে সুটকেশটা প্লাটফরমের ওপর রাখলো। তারপর ওর হাতলটা ঘুরিয়ে ওটা রেখে সোজা এগিয়ে গেল। রেস্তেরাঁ থেকে ফ্ল্যান্ড্রেস ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল। খুবই সন্দেহজনক।

ও দ্রুত স্টেশনের ধারের টিকিট নেবার জায়গাটার দিকে এগোতে লাগল। এদিকে চ্যান্সেলার ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জনতার অভিনন্দন নিচ্ছিলেন।

ক্লেয়ার প্লাসটিকের বাক্সটা প্লাটফরমে নামিয়ে বোতামটা টিপলো। তীব্র স্বরে সাইরেনের শব্দের পর বাক্সটা থেকে ক্লেয়ার লাফিয়ে সরে গেল। ল্যাংগার হঠাৎ শব্দ শুনে অনিশ্চিতভাবে প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে গেল। এরিখ স্টোলার ওর পেছনে। হাতে পিস্তল। তার পেছনে ও'মিয়েরা। ক্লারা বেক পেছন ফিরে হফারকে চিনতে পারলো। হঠাৎ সারা প্লাটফরম জুড়ে তীব্র আলোর ঝলকানি। প্লাটফরমের ওপর রাখা সুটকেশটা ততক্ষণে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়েছে। মাত্র পাঁচ সেকেন্ড। আসল খুনীকে আড়াল করার পরিকল্পনায় এওয়ার্ড পোর্টজ পিস্তলে ফাঁকা আওয়াজ করলো। সেই মুহূর্তে মার্টেল ওর পেছনে। হাতে কাল্ট ৪৫ রিভালভার।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্টেশনের একপ্রান্তেফ্ল্যান্ড্রেস নিজের লুগারটা চ্যান্সেলারের দিকে তাক করেছে। মার্টেলের রিভলভার থেকে পরপর তিনটে গুলি বার হলো। কিন্তু ব্যর্থ হলো। ফরাসী ভদ্রলোকের দেহস্পর্শকরলোনা।স্ট্যাম্বার্গারহফ স্টেশনের প্রবেশ মুখ দিয়ে ও অদৃশ্য হলো।

ওদিকে ক্লারা পিস্তলের ট্রিগার টিপতে উদ্যত। লক্ষ্য ক্লেয়ার হফার, ঠিক সেই মুহূর্তে স্টোলারের পিস্তল গর্জে উঠল আর বেক ছিটকে পড়ল।

অন্য প্রান্তে ও'মিয়েরা নিজের ৩৮ স্মিথ-ওয়েসন পিস্তল পোর্টজ-এর দিকে উদ্যত।

পোর্টজ ব্ল্যাংক ফায়ার করার পরে ইউ ব্যান-এর দিকে পালাতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে গুলিটা ওর পিঠে ঢুকল আর সঙ্গে সঙ্গে ওর নিশ্চল দেহটা পড়ে রইল মাটিতে।

স্টানবার্গারহফ থেকে ট্রেন সবেমাত্র ছাড়ছে। অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস প্লাটফরমের ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছিল। সময়টা গুরুত্বপূর্ণ। কামরার কাছে এসে দরজার হাতলটা ঘুরিয়ে খুললো দরজাটা, ঠিক সেই সময় গার্ড চীৎকার করল। মার্টেল দৌড়ে আসছিল সেদিকে। ফ্ল্যান্ড্রেস অর্ধেক ঢুকছে ট্রেনের কামরায়। বাকি অর্ধেক বাইরে। মার্টেল পরপর দুবার গুলি চালাল পিঠ লক্ষ্য করে।

এদিকে ট্রেনের গতিবেগ বেড়েছে। ফ্ল্যান্ড্রেসের দেহটা স্ট্যাচুর মতো খানিকটা দাঁড়িয়ে প্লাটফরমে আছড়ে পড়ল। মার্টেল ওর নিপ্রাণ–দেহটা পরীক্ষা করল।

***

তেসরা জুন, বুধবার

সামিট এক্সপ্রেসের রেস্টুরেন্ট কারে মার্টেল জার্মান চ্যান্সেলারের মুখোমুখি বসে, সিগারেট ধরিয়ে চ্যান্সেলারের উদ্দেশ্যে বললো, সোভিয়েট যখন তিরিশ বছর আগে ওদের লোক

দিয়ে ব্রেজে অধিকার করেছিল, ঠিক তখনই পূর্ব জার্মানীকে প্রক্সি হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

এক্সপ্রেস মিউনিখ ছাড়িয়ে এবার স্যালজবার্গ, তারপর ভিয়েনার পথে। মার্টেল স্বচ্ছন্দে বসে আছে। ওর সামনে দেশের প্রধানমন্ত্রী, অ্যামেরিকার আর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বসে। আর রয়েছে টুইড, স্টোলার, ও'মিয়েরা আর হাওয়ার্ড।

ল্যাংগার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে ব্যাপারটা ধরতে পারলে?

বলা যায় বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি। প্রত্যেকেরই ডাবল আছে।

আমি জানতাম আপনার ব্যক্তিগত সিকিউরিটি রয়েছে যদিও আপনি কখনও ব্যবহার করেননি। ওদের একজন লোক ছিল অ্যামেরিকান। হুবহু আসল ফ্ল্যান্ড্রেসের মত দেখতে। ওরা ফরাসী ফোর্সের মধ্যে ডাবল খোঁজার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভোরালবার্গে, টারলর আর ভিয়েনাতে। অবশেষে পেয়েছিল...।

একটু থেমে মার্টেল বলল, আসল ফ্ল্যান্ড্রেসকে কেউই খুব একটা ভাল চিনতো না।ওকে এমন একটা জায়গায় বদলী করা হয়েছিল যেখানে সবাই নতুন। তারপর...।

চ্যান্সেলার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু ফ্ল্যান্ড্রেসকে চিনলে কি করে?

মার্টেল বললো, এটা একটা বেদনাদায়ক ঘটনা। আমাদের আগে চার্লস ওয়ার্নার এজেন্ট ছিল। ও খুন হয়ে যায়। ওর নোটবুকে ব্রেজেঞ্জ-এর নাম পাওয়া যায়। ওখানে ওর ফটো দেখিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছেই। এখানে এক মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আসল ফ্ল্যান্ড্রেস খুন হবার আগে ওরই সাথে বিয়ে হয়েছিল। পূর্ব জার্মানরা মহিলাটিকে একেবারে বোকা বানিয়েছিল। ওর মৃত স্বামীকে অন্য নামে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। এটা এই জন্যে করেছিল যদি সেই নকল ফ্ল্যান্ড্রেস ফ্রান্সে গিয়ে আবার সিকিউরিটি সার্ভিসে ঢোকে তখন যাতে...।

মার্টেল এরপর একটু থামলো। প্রত্যেকে বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে।

মার্টেল আবার শুরু করল, ও'মিয়েরার ব্যাপারেও আমরা বাদ দিইনি। টুইড যখন ওর অতীত ব্যাপার খোঁজ করতে ক্লিন্ট লুমিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলো তখনই ও খুন হলো। ও'মিয়েরা দুমাস পশ্চিম বার্লিনে ছিল অজ্ঞাতবাসে।

এরপর মার্টেল হাওয়ার্ডের দিকে তাকালো। তারপর বলল, প্রত্যেকটি নিরাপত্তা প্রধানের একই ব্যাপার। যা কে. জি. বি-র কর্নেল পেস্কোভস্কিরও চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি অনুসরণ করে এগিয়েছি। হাওয়ার্ড, তোমার ব্যাপারেও সমস্যা আছে। আমরা জানতে পেরেছি প্যারিস দূতাবাসের সঙ্গে তুমি যখন যুক্ত ছিলে তখন তুমি ছ-সপ্তাহ ভিয়েনায় ছুটি কাটিয়েছিলে। তুমি কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই জানাওনি।

এরপর মার্টেল আরম্ভ করলো, এবার অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেসের প্রসঙ্গে আসা যাক। অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস বরাবরই সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল, অপর তিনজন নিরাপত্তা প্রধানের থেকে। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে কিছুই ছিলনা...।

এরপর মার্টেল বলে উঠলো, এই হচ্ছে সমস্ত ব্যাপার। আমি এখন স্যালবার্গে নেমে ঘুমাবো।

***

রেইনহার্ড দিয়েত্রিচের সঙ্গে ম্যানফ্রেড দেখা করতে যখন আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে এসে পৌঁছলো তখনই ও সতর্ক হয়ে গেল। বিস্মিত হয়ে দেখলো ম্যানফ্রেড, দিয়েত্রিচের মার্সিডিস পৌঁছে গেছে। ম্যানফ্রেডের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল আগে পৌঁছনোর।

ঘড়িটা দেখে ম্যানফ্রেড বুঝল ও নিজে সঠিক সময়েই পৌঁছেছে, দেরী করেনি। দিয়েত্রিচই তাড়াতাড়ি পৌঁছেছে। চারপাশটা ফাঁকা।

এক হাতে হুইল ধরে অন্য হাতে জানলাটা খুললো ম্যানফ্রেড, তারপর পাশে রাখা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা নিলো। এরপর দিয়েত্রিচকে ও দেখতে পেল।

দিয়েত্রিচকে লক্ষ্য করে ও বলে উঠল, তুমি খুব তাড়াতাড়ি এসেছে।

–আমি তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা নষ্ট করার জন্যে তুমিই দায়ী। কঠিন কণ্ঠে দিয়েত্রিচ বললো। গাড়ির মধ্যে বসেছিল। সামনের জানলাটা খোলা। ডান হাতে পিস্তল, বাঁ হাতে একটা গোলাকার ধাতব-পদার্থ।

ম্যানফ্রেড বলল, কারণ ল্যাংগার খুন হয়নি। আর ওর দল জিতে যাবে?

–হ্যাঁ। আমার সঙ্গে তুমি চালাকি করেছো। তুমি ডেলটাকে অস্ত্র সরবরাহ করার কথা বলে কাজ করেছিলে। আমি তোমায় সব সময় ডাম্প এর লোকেশান বলে গেছি। তুমি আর আমি ছাড়া ব্যাপারটা কেউ জানতো না। এবার বুঝেছি স্টোলারকে তুমিই সব জানিয়েছো। তুমি –তুমি একজন বদমাইস-বেলশেভিক–

দুজনেরই মুখ কঠিন। ম্যানফ্রেড রিভালভারটা তুলে দুবার গুলি ছুঁড়ল। দিয়েত্রিচ ডান পা দিয়ে লাথি মেরে দরজাটা পুরো খোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সফল হলোনা। গুলি খেয়ে আছড়ে পড়ল। ওর পাঁজর ভেদ করে ঢুকে গেছে ম্যানফ্রেডের বুলেট। প্যাসেঞ্জার সীটের ওপর পড়ে রইল ওর নিশ্চল–দেহটা।

এদিকে ওর হাত থেকে গড়িয়ে গোলাকার বস্তুটা কখন ম্যানফ্রেডের গাড়ির তলায় চলে গেছে ও খেয়াল করেনি। এটা নতুন একধরনের বোমা।

***

হাউপ্টব্যানহফের স্যালজবার্গ প্লাটফরমে তিনজন দাঁড়িয়েছিল। মার্টেল, টুইড আর হফার। ওদের সামনে থেকে সামিট এক্সপ্রেস ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে নিজের পরবর্তী

গন্তব্যস্থলে। দূরে দূরে বহুদূরে। এবার গন্তব্যস্থল ভিয়েনা, তাহলেই যাত্রা শেষ। টুইড বলে উঠলো, আমি এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। তিন সপ্তাহ থাকবো। ক্লেয়ারের দিকে তাকালো টুইড। বললো, চলি।

টুইডের দীর্ঘ শরীরটা আস্তে আস্তে ওদের চোখের সামনে থেকে সরে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল।

ক্লেয়ার মার্টেলের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো, পরিস্থিতির সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় লড়াইয়ের ক্ষমতা ওর আছে।

মিউনিখে ট্রেনটা পৌঁছোবার আগে ও যখন আমায় প্লাস্টিকের বাক্সটা দিয়েছিল তখন তো রীতিমতো চাপা-উত্তেজনা ছিল, টেনশন ছিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ওর মধ্যে কোন আবেগ ছিলনা। অত্যন্ত শান্ত, ধীর আর স্থির ছিল ঐ পরিস্থিতিতেও।

মার্টেল শুনে হফারকে বললো, তুমি তো এখন বার্নেতে রিপোর্ট দিতে যাচ্ছে।

–হ্যাঁ।

মার্টেল বললো, আমাকে এখন ক্লসন হোটেলে যেতে হবে। ওখানে ক্রিশ্চিনা ব্র্যাক রয়েছে। ওকে আবার ব্রেজেঞ্জে পৌঁছে দিতে হবে। ওকে জানাবো যে ওর স্বামীর ভূমিকায় যে কাজ করে যাচ্ছিল, সে মারা গেছে। সত্যিই ওর জীবনটা বড়ই দুঃখময়।

স্যালজবার্গের আকাশে রঙের ছটা লেগেছে।